গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন-এর

প্রাথমিক সুপারিশমালা

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি প্রজ্ঞাপন (ঢাকা ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১/১৮ নভেম্বর ২০২৪) বলে প্রফেসর তোফায়েল আহমেদকে প্রধান করে "স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করিবার লক্ষ্য" আট সদস্য বিশিস্ট একটি কমিশন গঠিত হয়।

কমিশন গঠিত হবার অব্যবহিত পরে কমিশনের একজন সদস্য জনাব এ এম এম নাসির উদ্দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ পাওয়ায় নতুন সদস্য নিয়োগের প্রশ্ন দেখা দেয়। অনেক যাচাই বাছাইয়ের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা, লেখক ও মানবাধিকার কর্মী মিসেস ইলিরা দেওয়ান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলামকে কোঅপ্ট করা হয় (প্রজ্ঞাপন তারিখ: ০৮ মাঘ, ১৪৩১বঙ্গাব্দ/২২ জানুয়ারী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ)।

কমিশনের কার্যালয় ঠিক করা, সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ বা ধার করা ইত্যাকারের কাজ কর্ম সম্পাদন করে পরিপূর্ণভাবে ২০২৪-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়। প্রতিবেদন কাঠামো হিসাবে ১৫টি বিভিন্ন ক্ষেত্র নির্ধারিত হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর সুনির্দিষ্ট অধ্যায়সমূহ লেখার কাজ এগিয়ে চলেছে।

যেহেতু কাজ পরিপূর্ণভাবে শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে, তাই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন শেষ করতে আরও কিছু সময় প্রয়োজন হবে । ইতোমধ্যে সরকার "জাতীয় ঐকমত্য কমিশন" গঠন করে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করছে। তাই স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন আলোচনা ও ঐক্যমত্য উপনীত হবার প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য এ কমিশনের তৈরীকৃত প্রাথমিক কিছু মৌলিক সুপারিশ এখনই সরকার ও ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার জন্য উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

প্রাথমিক সুপারিশের সাথে আরও দুইটি অধ্যায় বিশেষত সারা দেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর মাধ্যমে ৪৬৬৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে পরিচালিত মতামত জরিপ (অধ্যায়-১৫) এবং নির্বাচন বিষয়ক একটি অধ্যায় (অধ্যায়-৪) যুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের প্রত্যাশা, পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে এ সুপারিশসমূহ বিবেচনা পূর্বক ফলপ্রসূ আলোচনার অবতারণা হবে।

বিনীত

তোফায়েল আহমেদ
কমিশন প্রধান
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন
তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.

সূচিপত্র

ক্র.ন.	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
	মুখবন্ধ	-
	ভূমিকা: স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রাথমিক পর্যায়ের সুপারিশসমূহ	১
	স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রাথমিক পর্যায়ের সুপারিশের সারসংক্ষেপ	-
০১.	স্থানীয় সরকার সংগঠন	১-৯
০২.	আইন অবকাঠামো	৯-১০
০৩.	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী প্রতিনিধিত্ব	১০
০৪.	স্থানীয় সকার নির্বাচন সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ	১০-১৩
০৫.	পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার	১৪-১৫
০৬.	স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা	১৫-১৭
০৭.	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অর্থায়ন	১৭-১৮
০৮.	স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন	১৯
০৯.	স্থানীয় সরকার সার্ভিস কাঠামো	১৯-২০
১০.	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন	২০-২১
১১.	স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের পুর্নগঠনের সুপারিশ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং তার অধিনস্ত দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহের পুনর্গঠন	২১-২৩
১২.	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ	২৩
১৩.	অন্যান্য কমিশনের সুপারিশ	২৪
১৪.	বিবিধ	২৪-২৫
১৫.	অধ্যায়-৪: স্থানীয় সরকার নির্বাচন	২৬-৩৮
	সাংবিধানিক সংস্কার	২৯-৩৩
১৬.	অধ্যায়-১৫: স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ে জনমত জরিপ	৩৮-৪৩

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রাথমিক পর্যায়ের সুপারিশসমূহ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর অন্তবর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র পুর্নগঠনের গণদাবীর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগারটি সংস্কার কমিশন গঠন করেছেন। এ কমিশনমূহের মধ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আট সদস্য বিশিস্ট 'স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন' বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কমিশনের একজন সদস্য প্রধান নির্বাচন কমিশন এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কমিশনের ছাত্র প্রতিনিধির পদটিও পূরণ করা হয়নি। কমিশনের কর্মপরিধি বিবেচনায় বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নগর স্থানীয় সরকারের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের দুই জন সদস্য কোঅপ্ট করা হয়। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) পরামর্শে আগারগাঁস্থ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) ভবনের ৪র্থ তলায় কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও এনআইএলজি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে সংযুক্ত করা হয়েছে। কমিশন-কার্যালয়ের কক্ষসমূহ কার্যক্রম শুরুর উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, এসি, ইন্টারনেট সংযোগ এবং অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সকল ব্যয় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিশেষ বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের বেশির ভাগ এনআইএলজি কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখে গেজেট প্রকাশিত হলেও কমিশন পরিপূর্ণভাবে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি. তারিখের পর এর মূল কার্যক্রম শুরূ করতে সক্ষম হয়।

অদ্যাবধি কমিশনের সকল সদস্যগণ নিরলশভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশিন অন্যান্য কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের অধিকাংশ সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করছে এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে বেশকিছু সুপারিশ এ ছয়টি কমিশন প্রদান করেছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ইতোমধ্যে ছয়টি কমিশনের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর একটি "জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন" এর কার্যক্রম শুরূ করেছেন। দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরুতে কিছুটা বিলম্বিত হওয়ায় পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়নে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হতে পারে। এমতাবস্থায়, 'জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন' এর আলোচনার সুবিধার্থে অদ্যাবধি সমাপ্তকৃত কার্যক্রমসমূহের আলোকে তৈরিকৃত প্রাথমিক সুপারিশমালা জরুরী ভিত্তিতে পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করা হবে।

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সারসংক্ষেপ

১. স্থানীয় সরকার সংগঠন

১.১ দেশে তিন স্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান। এই তিন স্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এবং নগর স্থানীয় সরকারের দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৩০টি পৌরসভা ও ১২ টি সিটি কর্পোরেশন চলমান রয়েছে। এসকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইন ও সাংগঠনিক কাঠামোতে বড় ধরনের সংস্কারের প্রস্থাব করা হয়েছে।

তিনটি গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জেলা পরিষদের কার্য ও কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হবে। জেলা পরিষদ হবে একটি বিকেন্দ্রিকৃত পরিকল্পনা ইউনিট। ডেপুটি কমিশনারের অফিস

পৃথকভাবে জাতীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকবে। জেলা পরিষদে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে জেলার সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত দপ্তরগুলো জেলা পরিষদে ন্যস্ত হবে। যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে পদায়িত হবেন।

অনুরূপভাবে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ (Functionary), তাদের কার্যাদি (Functions) এবং অর্থ-সম্পদ (Fund) পরিষদে ন্যাস্ত হবে।

১.২ পুরো দেশে দ্রুত নগরায়নের ফলে নগর সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং গ্রামীণ এলাকা ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। তাছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ (ভৌত ও ভার্চুয়াল) ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারমান, ফলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা হ্রাস করে গ্রামীণ ও নগরীয় ব্যবস্থার বিভাজন দূর করে সমজাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও অধ্যয়ন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রস্তাবিত 'স্থানীয় সরকার কমিশন' সরকারকে বিশেষায়িত পরামর্শ দিতে সক্ষম হবে।

১.৩ বিদ্যমান গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড ব্যবস্থা রয়েছে, উপজেলায় একই নির্বাচনী এলাকা থেকে চেয়ারম্যান ও দুই জন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জেলা পরিষদে সরাসরি কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনটি স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন প্রকৃতি, নির্বাচন, দায়িত্ব বণ্টন, কর আদায় ও কেন্দ্রের অর্থায়ন এবং আন্ত-প্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন বিধায় এগুলোর ব্যাপক আইনগত, সাংগঠনিক, কাঠামোগত, সেবা ও শাসনকাঠামোতে বিস্তর পরিবর্তন প্রয়োজন।

১.৪ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের আইন কাঠামো, সংগঠনিক কাঠামো ও নির্বাচন ব্যবস্থা অসম পদ্ধতিতে বিন্যস্থ। এটিকে একটি সমজাতীয় পদ্ধতিতে পুনঃস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

১.৫ দেশের জাতীয় সরকারের আদলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংসদীয় পদ্ধতির আদলে পুনর্গঠন, নির্বাচন ও কার্যপদ্ধতি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে কমিশন কিছু নতুন পদ্ধতি/পন্থা অবলম্বন করছে।

১.৬ এ পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়িত হলে নির্বাচন ব্যবস্থা সহজ, ব্যয় সাশ্রয়ী, সুস্থ ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, তৃণমূলে গণতান্ত্রিক ও গঠনমূলক নীতিবিতর্ক করার ইতিবাচক একটি ব্যবস্থার বিকাশ হতে পারে।

১.৭ গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নতুন পদ্ধতির অধীনে নিম্নলিখিত তিনটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

(ক) বর্তমানে, ১৯৬০ এর দশকের (পাকিস্তান আমলের) জেনারেল আইয়ুব খান প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার আদলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংসদীয় পদ্ধতির আদলে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে।

(খ) তিনটি পৃথক আইনের বদলে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদকে একটি একক আইনের অধীনে আনা হবে। একইভাবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহকে ভিন্ন একটি একক আইনের অধীনে আনা হবে। বর্তমানে বিরাজিত পাঁচটি পৃথক আইনের স্থলে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুটি মৌলিক আইনের অধীনে আসা যেতে পারে।

(গ) নতুন আইনের অধীনে একই তফসিলে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অধীনে আনায়নের সুপারিশ করা হবে। এ নির্বাচন হবে সরকার এবং প্রার্থী উভয়ের দিক থেকে ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী।

১.৮ জাতীয় সংসদে যেমন নির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দ থাকেন সকল সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু, গ্রাম ও নগর নির্বিশেষে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা কাউন্সিলরগণ হবেন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান নিয়ামক ।

১.৯ গ্রাম-নগর নির্বিশেষে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কাঠামো দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত থাকবে, যথা (১) বিধানিক অংশ (Legislative Part) এবং (২) নির্বাহী অংশ (Executive Part)

১.১০ বিধানিক অংশের প্রধান হবেন "সভাধ্যক্ষ"(জাতীয় সংসদ স্পিকার এর অনুরূপ) এবং নির্বাহী অংশের প্রধান হবেন "চেয়ারম্যান বা মেয়র"। তিনি পরিষদ বা কাউন্সিল নেতা হিসাবেও পরিগণিত হবেন।

১.১১ সভাধ্যক্ষ জাতীয় সংসদের স্পিকারের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি চেয়ারম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে পরিষদের সভা/অধিবেশন আহবান করবেন। সকল সদস্য/সদস্যা যাতে তাদের মতামত দিতে পারেন, কোনো বিশেষ বিষয়ে বিতর্কে অংশ নিতে পারেন সেসব বিষয়সমূহ তিনি নিশ্চিত করবেন। তেমনি ভাবে সকল স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন ও সভাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১.১২ সভাধ্যক্ষকে সহায়তা করবেন একজন পূর্ণকালীন 'সচিব' এবং পাঁচ সদস্যের একটি সচিবালয়।

১.১৩ সাধারণ নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গেজেট প্রকাশের পর সকল সদস্যগণ আইনে নির্ধারিত একটি শপথনামা উপস্থিত একটি ভোটার সমাবেশে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে হাত রেখে একে একে উচ্চ স্বরে পাঠ করে সেটিতে স্বাক্ষর করবেন এবং সদস্যদের জন্য রক্ষিত আসনে আসন গ্রহণ করবেন। পরিষদ বা কাউন্সিলের বাইরে থেকে কোনো কারিকর্তা এসে সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন না।

১.১৪ শপথ গ্রহণের পর পরিষদের প্রথম সভায় সকল সাধারণ সদস্যের ভোটে সভাধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে শপথের পর 'সভাধ্যক্ষ' নির্বাচনের মনোনয়ন গ্রহণ করবেন এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভাধ্যক্ষ নির্বাচন সমাপ্ত করবেন।

১.১৫ সভাধ্যক্ষ নির্বাচিত হবার পরে তাঁর সভাপতিত্বে পরিষদের চেয়ারম্যান বা কাউন্সিলের মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরিষদের অভ্যন্তরে গোপন ব্যালটে সদস্যগণ সদস্যদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান এবং মেয়র নির্বাচন করবেন। এ সময় উপজেলা নির্বাচন অফিস বা নির্বাচন কমিশন মনোনীত কোনো উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন, তিনি সভাধ্যক্ষকে এ নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করবেন।

১.১৬ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর তিনি 'পরিষদ নেতা' হিসাবে তাঁর নির্ধারিত আসনে উপবিষ্ট হবেন এবং তিনি আইন অনুযায়ী তিন বা পাঁচ সদস্য বিশিস্ট চেয়ারম্যান বা মেয়রের 'নির্বাহী কাউন্সিল' গঠন করে তা পরিষদের অবগতির জন্য সভাধ্যক্ষের নিকট পেশ করবেন। নির্বাহী পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১.১৭ পরিষদ বা কাউন্সিল কোনো নির্বাহী সদস্যের ব্যাপারে আপত্তি জানাতে পারেন। আপত্তি জানালে চেয়ারম্যান বা মেয়র নির্বাহী পরিষদ পুর্নগঠনের সুযোগ পাবেন। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় পরিষদের বিবেচ্য বিষয় হতে পারে যে, চেয়ারম্যান, মেয়র এবং নির্বাহী সদস্যগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাক্রমে স্নাতক এবং নির্বাহী সদস্যগণ মাধ্যমিক পাশের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

১.১৯ পরিষদের একজন পরিষদ নেতা থাকবেন। তিনি হবেন চেয়ারম্যান বা মেয়র । "চেয়ারম্যান পরিষদ" ও "মেয়র কাউন্সিল" গঠিত হবার পর সভাধ্যক্ষ একজন 'ছায়া পরিষদ' নেতা নির্বাচনের আহবান জানাবেন। ছায়া পরিষদ নেতা পরিষদ বা কাউন্সিলে বিরোধী নেতা হিসাবে স্বীকৃত হবেন। চেয়ারম্যান, মেয়র এবং নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ ব্যতিত অন্য সকল সদস্য বা কাউন্সিলরগণ ছায়া পরিষদ নেতাকে ভোট দিতে পারবেন। 'ছায়া পরিষদ নেতা' নির্বাচনের পর পরবর্তি এক সপ্তাহের মধ্যে পরবর্তি অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করে সভা শেষ হবে।

১.২০ পরবর্তী সভার মূল কার্যসূচি হবে ‘স্থায়ী কমিটি’ সমূহ গঠন। ইউনিয়ন পরিষদে সর্বোচ্চ ৬ টি উপজেলা পরিষদে ১০টি, জেলা পরিষদে ১০টি, পৌরসভায় ৬টি এবং সিটি কর্পোরেশনের ১০টি স্থায়ী কমিটি থাকবে। কমিটিসমূহের নাম, বিষয় ও কার্যপদ্ধতি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

১.২১ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশেনের সভাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান, মেয়র (পরিষদ নেতা) ছায়া পরিষদ নেতা, স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সাধারণ সদস্যগণের দায়িত্ব , র্কতব্য ও অধিকার প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে আইনে বর্ণনা করা থাকবে।

১.২২ পরিষদ ও কাউন্সিলে সকলের মর্যাদাক্রম হবে নিম্নরূপ:

প্রথম : চেয়ারম্যান বা মেয়র (পরিষদ/কাউন্সিল নেতা),

দ্বিতীয় : সভাধ্যক্ষ,

তৃতীয় : ছায়া পরিষদ/কাউন্সিল নেতা,

চতুর্থত : নির্বাহী সদস্য/কাউন্সিলরগণ,

পঞ্চমত : স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং

ষষ্ঠত : সাধারণ সদস্য/কাউন্সিলরগণ

১.২৩ চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ এবং তাদের নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণ হবেন পরিষদসমূহ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সার্বক্ষণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। তারা নিয়মিত বেতন-ভাতা গ্রহণের অধিকারী হবেন। চেয়ারম্যান ও মেয়রগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসাবে গণ্য হবেন। নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাহীর এক স্তর ওপরের গ্রেডে বেতন/ভাতাদি পাবেন। নির্বাহী কাউন্সিলের অন্যান্য সকল সদস্যগণ সরকারের চাকুরিতে প্রবেশকালীন সময়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার সমান বেতন ভাতাদি পাবেন। চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যানের নির্বাহী পরিষদ এবং মেয়র ও মেয়র কাউন্সিল স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

১.২৪ সভাধ্যক্ষ ও ছায়া পরিষদ নেতা নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্যগণের সমান বেতন-ভাতা পাবেন এবং পরিষদের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসাবে বিবেচিত হবেন।

১.২৫ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ অবতৈনিক হবেন। তাঁরা সভায় উপস্থিতির জন্য একটি সম্মানী গ্রহণ করতে পারবেন।

১.২৬ কোনো চেয়ারম্যান, মেয়র, সভাধ্যক্ষ, ছায়া পরিষদ নেতা, সদস্য ও কাউন্সিলর অবৈতনিক হিসাবে কাজ করতে চাইলে বা সম্মানী না নিতে চাইলে পরিষদকে অবহিত করে বিনা পারিশ্রমিক বা বিনা সম্মানীতে সেবা দিতে পারবেন।

১.২৭ প্রতি তিন মাসে একাধারে সর্বাধিক তিন দিন বা পৃথক দিন-তারিখে পরিষদসমূহের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

১.২৮ সভাধ্যক্ষ ও মেয়র পরামর্শ করে যে কোনো সময় পর্যাপ্ত সময় ও প্রস্তুতি সহকারে নিয়মিত সভা, বিশেষ সভা ও জরুরি সভা আহবান করতে পারবেন।

১.২৯ সভাধ্যক্ষ সচিবের সহায়তায় সভা পরিচালনা বিষয়ে বিস্তারিত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করবেন। সে নির্দেশিকায় সভার এজেন্ডা নির্ধারণ পদ্ধতি, আলোচনায় অংশগ্রহণ, বিতর্কে অংশগ্রহণের নিয়মনীতি, আলোচনার জন্য সদস্যদের নোটিশ প্রদান, কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা, সভায় ভাষার শালীনতা, শোভনীয়তা, সদস্যগণের আচরণ প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে লেখা থাকবে। খসড়া নির্দেশিকা পরিষদে পেশ করা হবে। আলোচনা ও তর্ক-বির্তকের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সব কিছু অনুমোদিত হতে হবে।

১.৩০ সময়ের প্রয়োজনে অধিবেশন সভা বা সভার কার্যপ্রণালী সংশোধিত হবে।চেয়ারম্যান, মেয়র , সভাধ্যক্ষ ও ছায়া পরিষদ নেতা পরিষদ বা কাউন্সিলের আস্থা হারালে সে পদে পুনরায় নির্বাচন হবে। আস্থা অনাস্থার বিষয়টির বিস্তারিত পদ্ধতি আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। শুধুমাত্র দুর্নীতি প্রমাণ ব্যতিত এখানে সরকার কর্তৃক কাউকে বরখাস্ত করার বিধান থাকবে না।

১.৩১ সভার সকল সিদ্ধান্ত সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে হবে, তবে কোনো নীতিমালা বা উপবিধির সংশোধনীতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে।

১.৩২ মেয়র কাউন্সিল ও চেয়ারম্যান কাউন্সিলের দপ্তর বণ্টন এবং মেয়র কাউন্সিল কীভাবে কাজ করবে সে বিষয়ে সরকার একটি বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারে। সে বিধিমালার আলোকে সকল মেয়র বা চেয়ারম্যান কাউন্সিল নিজস্ব উপবিধি প্রণয়ন করে তা পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করিয়ে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করবে।

১.৩৩ প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন প্রতি বছর এপ্রিল মাসে তিন দিনের একটি বার্ষিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অধিবেশন করবে।

১.৩৪ অধিবেশনে উপর বা নিচ স্তরের সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ারম্যান বা তার প্রতিনিধি ঐসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বা তার প্রতিনিধি, এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রকৌশল, কৃষি, মৎস, সমাজসেবা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপিসহ সকল কর্মকর্তা, এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি/বেসরকারি সংস্থার বিশেষত প্রতিনিধিত্বশীল নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য বা তার প্রতিনিধির অংশগ্রহনও আবশ্যক বিবেচিত হবে। এই পরিকল্পনা অধিবেশনের পূর্বে স্ব-স্ব পরিষদ ভৌত অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পয়ঃনিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা, বন্যা, সেচসহ কৃষির নানা দিক, পরিবেশ, আইন-শৃঙ্খলা, মাদকাসক্তি, মানবাধিকার, সুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে পরিষদ নিজের প্রয়োজনমত নানা বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করে পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তত করবেন এবং সভাধ্যক্ষ এসকল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন।

১.৩৫ উপরে উল্লিখিত খসড়া পরিকল্পনায় অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যৌথভাবে যুক্ত করা যাবে। এলকায় কর্মরত এনজিও, সিএসও এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের পরিকল্পনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পনাও পৃথকভাবে ঐ পরিকল্পনায় যুক্ত হতে পারে।

১.৩৬ অধিবেশন শেষে খসড়া পরিকল্পনা চুড়ান্ত করে পরিষদে এ পরিকল্পনা অনুমোদিত হবে।

১.৩৭ পরিকল্পনা অনুমোদনের পর পরিষদের নির্দিষ্ট স্থায়ী কমিটি এ পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিষদের রাজস্ব/ অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের খসড়া প্রণয়ন করবে।

১.৩৮ পরিকল্পনা অধিবেশনের অনুরুপ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর মে-জুন মাসের মধ্যে বৃহত্তর জমায়েতে পরিকল্পনা ও বাজেট পেশ করা হবে। এ অধিবেশনে একদিন পরিকল্পনা, অপরদিন বাজেট সর্বসাধারনের আলোচনার জন্য পেশ করা হবে।

১.৩৯ পরিকল্পনা ও বাজেট অধিবেশনের পর তা কাউন্সিল ও পরিষদে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে।

১.৪০ পরবর্তীতে চেয়ারম্যান বা মেয়রের নির্বাহী পরিষদ নিজস্ব ও হস্তান্তরিত সরকারি বিভাগের কর্মচারিদের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাজেট বাস্তবায়ন করবে।

১.৪১ প্রতিটি স্থায়ী কমিটি প্রতি দুই মাস অন্তর প্রযোজ্য বিষয়সমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে কার্যবিবরণী তৈরি করবে।

১.৪২ এ কার্যবিবরণী সমূহ সুনির্দিষ্ট একটি এজেন্ডা হিসেবে পরিষদের নিয়মিত সভায় আলোচিত হবে।

১.৪৩ স্থায়ী কমিটিসমূহ এজেন্ডার বিষয় অনুসারে যে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আলোচনার জন্য আহবান করতে পারবে।

১.৪৪ সকল স্থায়ী কমিটিতে আনুপাতিকহারে চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নারীর অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য হবে।

১.৪৫ বিশেষ কোনো এজেন্ডায় গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন হলে পরিষদ সভায় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার সীমিত করতে পারেন। তবে সাধারণভাবে সভা/অধিবেশনসমূহে অনুমতি সাপেক্ষে পর্যবেক্ষক হিসাবে সর্বসাধারনের প্রবেশাধিকার থাকবে।

১.৪৬ পরিষদ বা কাউন্সিলসমূহে সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশিকা, চেয়ারম্যান ও মেয়র কাউন্সিলের কার্যপদ্ধতি স্থায়ী কমিটির কার্যপদ্ধতি, সকল প্রযোজ্য বিধি ও উপবিধি বা উপআইন বিষয়ে স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন এর নির্দেশনা ও সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয় তা কার্যকর করবে।

১.৪৭ ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা স্তরে কয়টি স্থায়ী কমিটি হবে এবং কমিটিসমূহের কর্মপদ্ধতি ও কর্মপ্রক্রিয়া বিশদ আলোচনা করে স্থানীয় সরকার কমিশনের কাঠামো ও একাধিক খসড়া আইন মূল প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হবে।

১.৪৮ স্থানীয় সরকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত একটি সাংগঠনিক কাঠামোর লেখচিত্র সাথে সংযুক্ত করা হলো।

১.৪৯ ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিচালিত ‘গ্রাম আদালত’ বিলোপ করে উপজেলায় দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিয়োজিত বিচারকের সাথে ওয়ার্ড ও কমিউনিটি পর্যায়ের একটি সালিশী ব্যবস্থাকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১.৫০ পাচঁটি স্থানীয় সরকার সংস্থার যে কোনো সার্বক্ষণিক কর্মী যথা সভাধ্যক্ষ, চেয়ারম্যান, মেয়র, ছায়া পরিষদ নেতা পরিষদ বা কাউন্সিলের আস্থা হারালে পদসমূহ শূন্য হবে। চেয়ারম্যান বা মেয়রের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে চেয়ারম্যান ও মেয়র কাউন্সিলকেও পদত্যাগ করতে হবে।অনাস্থা প্রস্তাব অনয়নের পদ্ধতি আইন ও বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে।

১.৫১ মেয়র ও মেয়র কাউন্সিলের সদস্যগণ এবং চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান পরিষদের/কাউন্সিলের সদস্য/ কাউন্সিলরগণ ছাড়া বাকি সকল সদস্যগণ ছায়া পরিষদ নেতার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। সভাধ্যক্ষ সাধারণত পরিষদের অভ্যন্তরে কোনো নির্বাচন ও অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটে অংশ নিবেন না, তবে সমসংখ্যক ভোটে কোনো সিদ্ধান্ত ঝুলে গেলে একটি কাস্টিং ভোট দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা বা পুনরায় ভোটে দিয়ে মিমাংসায় আসতে পারেন।

১.৫২ গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটি পরিষদের কার্যসমূহ ও কার্যপদ্ধতির স্পস্ট বিভাজন থাকবে। জেলা পরিষদ হবে স্পস্টত পরিকল্পনা ইউনিট বা একক। এখানে জেলার সকল সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হবে। উপজেলা নিজ উপজেলার সেবা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ভৌত অবকাঠামো, কৃষি, প্রাণীসম্পদ, পানিসম্পদ প্রভৃতি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকবেন।

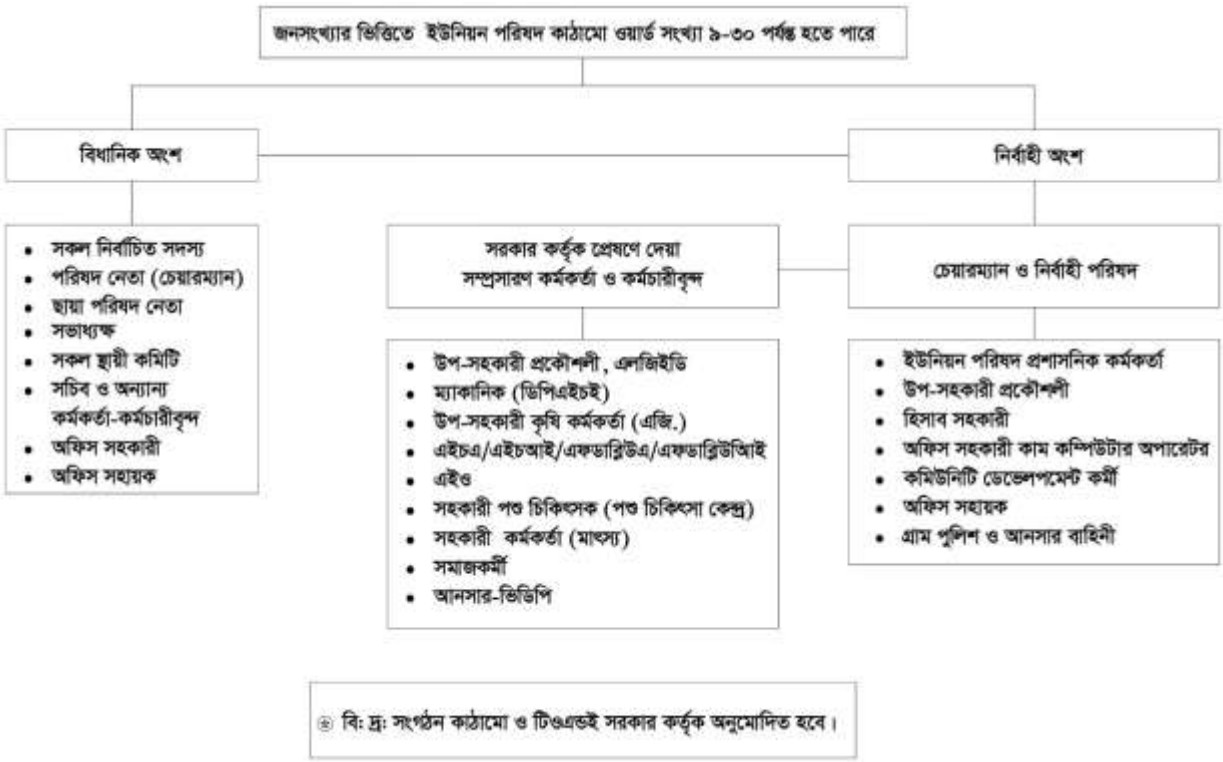

জনসংখ্যার ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামো ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-৩০ পর্যন্ত হতে পারে

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- ছায়া পরিষদ নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

নির্বাহী অংশ

সরকার কর্তৃক প্রেষণে দেয়া সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

- উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি
- ম্যাকানিক (ডিপিএইচই)
- উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এজি.)
- এইচএ/এইচআই/এফডাব্লিউএ/এফডাব্লিউভিআই
- এইও
- সহকারী পশু চিকিৎসক (পশু চিকিৎসা কেন্দ্র)
- সহকারী কর্মকর্তা (মাৎস্য)
- সমাজকর্মী
- আনসার-ভিডিপি

চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিষদ

- ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী
- হিসাব সহকারী
- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কর্মী
- অফিস সহায়ক
- গ্রাম পুলিশ ও আনসার বাহিনী

※ বি: দ্র: সংগঠন কাঠামো ও টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

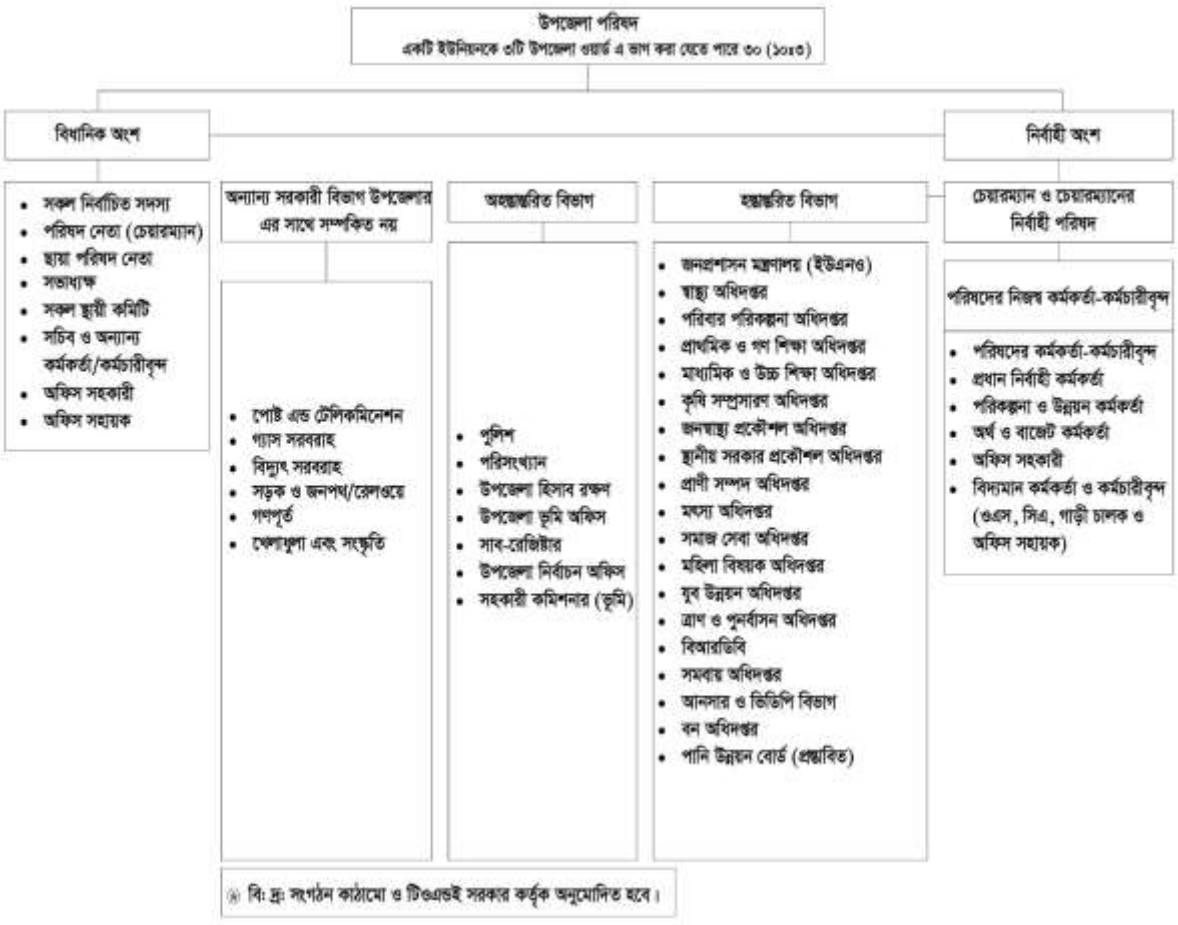

উপজেলা পরিষদ
একটি ইউনিয়নকে ৩টি উপজেলা ওয়ার্ড এ ভাগ করা যেতে পারে ৩০ (১০x৩)

বিধানিক অংশ

- সকল নির্বাচিত সদস্য
- পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
- ছায়া পরিষদ নেতা
- সভাধ্যক্ষ
- সকল স্থায়ী কমিটি
- সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
- অফিস সহকারী
- অফিস সহায়ক

অন্যান্য সরকারী বিভাগ উপজেলার এর সাথে সম্পর্কিত নয়

- পোষ্ট এন্ড টেলিকমিনেশন
- গ্যাস সরবরাহ
- বিদ্যুৎ সরবরাহ
- সড়ক ও জনপথ/রেলওয়ে
- গণপূর্ত
- খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি

অহস্তান্তরিত বিভাগ

- পুলিশ
- পরিসংখ্যান
- উপজেলা হিসাব রক্ষন
- উপজেলা ভূমি অফিস
- সাব-রেজিষ্টার
- উপজেলা নির্বাচন অফিস
- সহকারী কমিশনার (ভূমি)

হস্তান্তরিত বিভাগ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (ইউএনও)
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
- প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
- মৎস্য অধিদপ্তর
- সমাজ সেবা অধিদপ্তর
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
- বিআরডিবি
- সমবায় অধিদপ্তর
- আনসার ও ভিডিপি বিভাগ
- বন অধিদপ্তর
- পানি উন্নয়ন বোর্ড (প্রস্তাবিত)

নির্বাহী অংশ

চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যানের নির্বাহী পরিষদ

পরিষদের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

- পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ
- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকর্তা
- অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তা
- অফিস সহকারী
- বিদ্যমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ (ওএস, সিএ, গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক)

※ বি: দ্র: সংগঠন কাঠামো ও টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

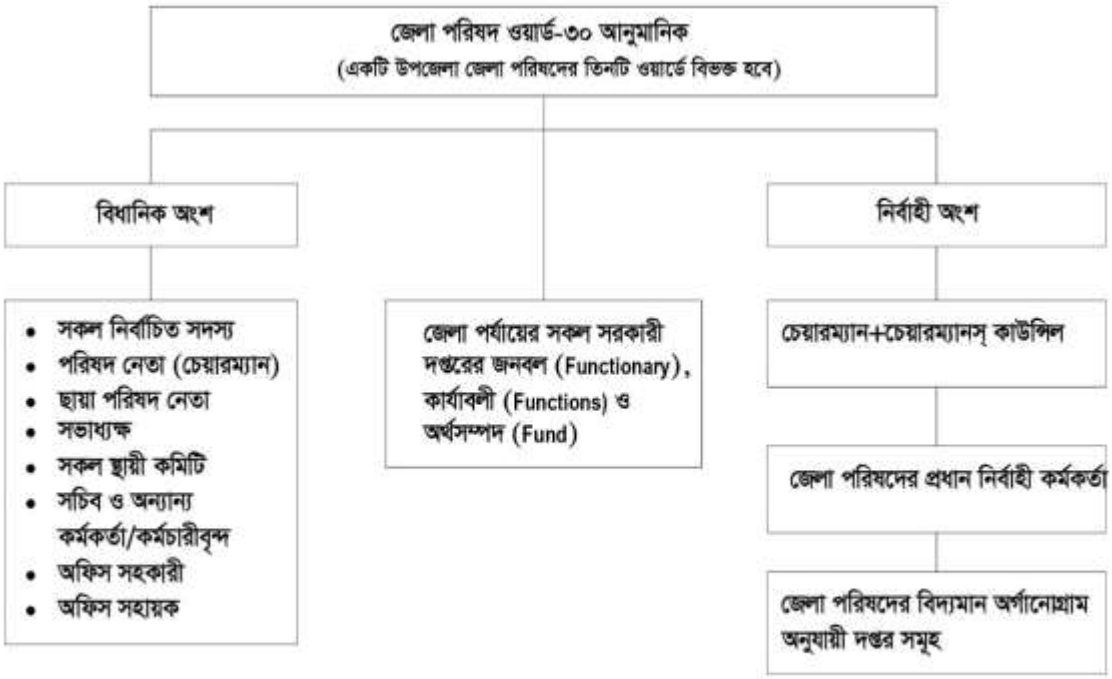
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড-৩০ আনুমানিক
(একটি উপজেলা জেলা পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে)
বিধানিক অংশ
নির্বাহী অংশ
সকল নির্বাচিত সদস্য
পরিষদ নেতা (চেয়ারম্যান)
ছায়া পরিষদ নেতা
সভাধ্যক্ষ
সকল স্থায়ী কমিটি
সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
অফিস সহকারী
অফিস সহায়ক
জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী দপ্তরের জনবল (Functionary), কার্যাবলী (Functions) ও অর্থসম্পদ (Fund)
চেয়ারম্যান+চেয়ারম্যানস্ কাউন্সিল
জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দপ্তর সমূহ

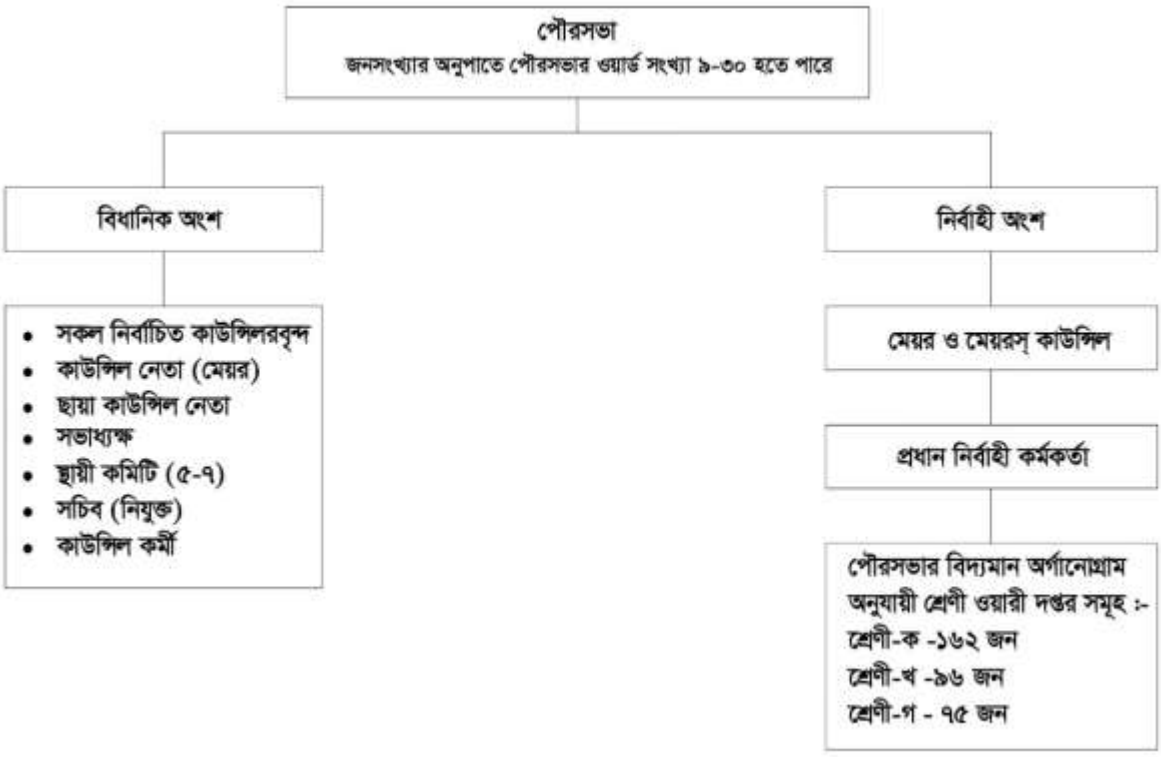
পৌরসভা
জনসংখ্যার অনুপাতে পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৯-৩০ হতে পারে
বিধানিক অংশ
নির্বাহী অংশ
সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরবৃন্দ
কাউন্সিল নেতা (মেয়র)
ছায়া কাউন্সিল নেতা
সভাধ্যক্ষ
স্থায়ী কমিটি (৫-৭)
সচিব (নিযুক্ত)
কাউন্সিল কর্মী
মেয়র ও মেয়রস্ কাউন্সিল
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
পৌরসভার বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শ্রেণী ওয়ারী দপ্তর সমূহ :-
শ্রেণী-ক -১৬২ জন
শ্রেণী-খ -৯৬ জন
শ্রেণী-গ - ৭৫ জন

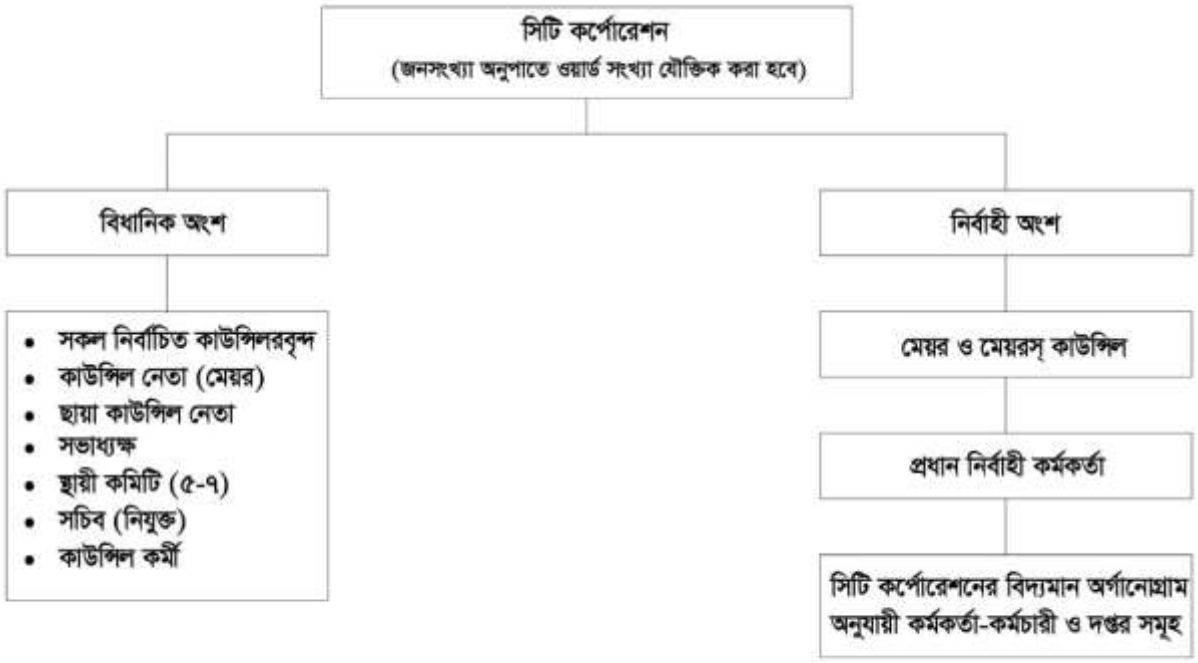

২. আইন কাঠামো

২.১ বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতিত সারাদেশে স্থানীয় সরকারের পাঁচটি মৌলিক আইন রয়েছে, যথা ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন, জেলা পরিষদ আইন, পৌরসভা আইন ও সিটি কর্পোরেশন আইন। আইনসমূহ ভিন্ন ভিন্ন থাকার কারণে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদ কাঠামো অসামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটি প্রতিষ্ঠানকে তিনটি পৃথক আইনের বদলে একটি একক আইন ও নগর স্থানীয় সরকারের দুইটি প্রতিষ্ঠান যথা পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনকে আর একটি একক আইনের অধীনে এনে কাঠামোগত সামঞ্জস্যতা বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ রকম দুইটি আইন করা হলে ঐ আইন বলে পাঁচটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো হবে একই ধাচের সংসদীয় পদ্ধতির। ফলে দেশের ৫টি প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে পাঁচ বছরে মাত্র একবার সর্বাধিক দেড় থেকে দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হতে পারে এতে করে নির্বাচন ব্যবস্থাটিও ব্যয় সাশ্রয়ী ও সময় সাশ্রয়ী হবে।

২.২ অভিন্ন বা সমন্বিত দুইটি স্থানীয় সরকার আইন এর খসড়া এ কমিশন প্রস্তাব আকারে পেশ করছে। যা অন্তরবর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ আকারে প্রণয়ন করতে পারে, অথবা পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকার আইন আকারে প্রণয়ন করতে পারে। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্য ও সেবা প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন থাকবে। কার্য ও সেবা, মূল পরিষদের বিধানিক ও নির্বাহী কার্যক্রম, স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম, জনবল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান বিধিসমূহ পর্যালোচনা করে নতুন আইনের সাথে সমঞ্জস্য বিধান করে নতুন বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন হবে। বিশেষজ্ঞ সম্বলিত "স্থানীয় সরকার কমিশন" এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করতে পারে।

২.৩ বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য, নারী সদস্য ও চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হলেও উপজেলায় চেয়ারম্যান, সাধারণ আসনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত নারী আসনের ভিন্ন পদধারী তিনজন

একই আকারের নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। আবার জাতীয় সংসদ সদস্যেরও নির্বাচনী এলাকা প্রায় ক্ষেত্রে অভিন্ন। এই চার প্রতিনিধির মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। এখানে নির্বাচন ব্যবস্থা ও এখতিয়ারের ক্ষেত্র পরিবর্তন প্রয়োজন। অপরদিকে জেলা পরিষদে জনগণের ভোটদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। আকার ও ভোটার সংখ্যা বিবেচনায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন প্রায় অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে ওয়ার্ড সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বর্তমানে জেলা ও উপজেলায় কোনো ওয়ার্ড নেই। উপজেলায় নারী সদস্য নির্বাচনের বিধান থাকলেও তা অকার্যকর। তাই ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলায় প্রত্যক্ষ ভোটে ওয়ার্ড সদস্য নির্বাচনের বিধান প্রস্তাব করা হলো।

৩. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী প্রতিনিধিত্ব

৩.১ বাংলাদেশের সংবিধান নারীকে প্রজাতন্ত্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুল ধারায় নিয়ে আসার বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে। সংবিধানের ২৮(২) ধারায় বলা হয়েছে যে, নারীরা রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে, ধারা ২৮(৪), অনুযায়ী রাষ্ট্র নারীদের,শিশুদের বা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে।

৩.২ এই প্রস্তাবে বিদ্যমান সংরক্ষিত নারী আসন পদ্বতি পরিবর্তন করে পুরো পরিষদের এক তৃতীয়াংশ ওয়ার্ড (একক অসন) ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষন করে পুনর্গঠন করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রতিটি পরিষদে ও কাউন্সিলে মোট ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ প্রতি নির্বাচনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হবে।

৩.৩ প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকারের নুতন কাঠামো অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগন পদাধিকার বলে চেয়ার ও মেয়র কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যপদ লাভ করবেন।

৩.৪ স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে এবং প্রতিষ্ঠান সমুহের স্থায়ী কমিটিগুলিতে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগন আনুপাতিক হারে চেয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৩.৫ দক্ষ নারী সদস্যগন চেয়ারপার্সন ও মেয়র, সভাধ্যক্ষ ও ছায়া পরিষদ নেতা ইত্যাদি পদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারবেন।

৩.৬ তিনটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে বিভিন্ন জাতিসত্বা অধ্যুষিত এলাকার নারীরা এই সংরক্ষিত নারী আসনের বিশেষ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

৩.৭ জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বিকাশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে, এবং সে মোতাবেক নারী সদস্যদের আনুপাতিক কোটা নির্ধারন করা হবে।

৪. স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ

৪.১ সংবিধানের স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত বিধানসমূহের পুনঃপর্যালোচনা দরকার এবং এখানে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথমে তিনটি সুপারিশ করা যেতে পারে।

৪.২ সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদের সকল “স্থানীয় শাসন” শব্দাবলির স্থলে “স্থানীয় সরকার” প্রতিস্থাপিত হবে। স্থানীয় সরকার (Local Government) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শব্দ বা প্রত্যয়। অনুবাদ করতে গিয়ে স্থানীয় সরকারে মূল ধারণা বিকৃত হয়ে পড়েছে। তাই স্থানীয় সরকার সংবিধানে সংস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

৪.৩ নির্বাচনসহ সকল ক্ষেত্রে “সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন” এ ধারাটির এ অংশ সংশোধন করে সংবিধানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য জন্য উপযোগী একটি কার্যশীল সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ

করে দিতে পারে। যা জাতীয় সরকার ও দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে কাঠামোর সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতি যুক্ত থাকতে পারে। সে কাঠামোটি হতে পারে দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় সরকারের মত রাষ্ট্রপতি সরকারের আদলের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির প্রতিরূপ। বিরাজিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে চেয়ারম্যান ও মেয়র সর্বস্ব এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার মত করেই কাজ করে। এখানে পরিষদ অচল থাকে, এক ব্যক্তির একক এক ধরনের স্বৈরশাসন বলবৎ হয়।

৪.৪ সংবিধানের ১১৯ (১) অনুচ্ছেদে একটি নতুন লাইন যুক্ত করা যেতে পারে **"নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে স্থানীয় পরিষদের নির্বাচন সমূহ পরিচালনা করিবে"** এটি হলে নির্বাচন কমিশন সরকারের অনুরোধের অপেক্ষা না করে নিজেরা স্বাধীনভাবে স্থানীয় নির্বাচনের সকল তফসিল সময়মত নির্ধারণ করতে সাংবিধানিকভাবে সক্ষম হবে।

৪.৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতীক (দলীয় প্রতীক) ব্যবহার করা যাবে না।

৪.৬ আইন, সংগঠন ও অন্যান্য কাঠমোগত সংস্কার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো:

৪.৬.১ ১৯৭২ সালের পর ৫টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য পাস্পরিক সম্পর্কবিহিন যে ৫টি পৃথক আইন ও অসংখ্য বিধিমালা বিভিন্ন সময় জারি করা হয়েছে। সে সকল আইন ও বিধিসমূহ বাতিল করে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ দুইটি একীভুত ও একক স্থানীয় সরকার আইন ও প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করে সকল পরিষদ সমূহের মধ্যে আন্তঃ প্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এরকম দুইটি আইন করা হলে ঐ আইন বলে পাঁচটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো হবে একই ধাচের সংসদীয় পদ্ধতির। তখন নির্বাচন ব্যবস্থাটিও হবে সহজ, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী।

৪.৬.২ সংরক্ষিত নারী আসনের ক্ষেত্রে প্রতি তিন আসনের মধ্যে একজন সংরক্ষিত নারী সদস্য নির্বাচনের পরিবর্তে প্রতি নির্বাচনে ঘূর্নায়মান পদ্ধতিতে পুরো পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। তিনটি নির্বাচন ঘুর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন হবার পর চতুর্থ নির্বাচনে সংরক্ষণ পদ্ধতি বিলোপ করে সবার জন্য সকল আসন উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে। তখন থেকে নারী-পুরুষ সবাই সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচন করার সুপারিশ করা হলো। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত নারী আসনসমূহ ঘুর্ণায়মান (রোটেশনাল) পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সংরক্ষণ করে পূরণ করা যেতে পারে। এতে করে সংগঠনে দ্বৈততা পরিত্যক্ত হবে। নারীগণ একটি নিজস্ব আসনে প্রতিনিধিত্ব করে শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়নে কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারবেন।

৪.৬.৩ গ্রাম ও নগরের সর্বত্র সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো হবে সমরূপ। স্থানীয় সরকারের **"স্থানীয় সরকার সার্ভিস"** নামক একটি নিজস্ব সার্ভিস কাঠামো থাকবে। সে সার্ভিসের অধীন জনবলের উর্ধমূখি ও নিম্নমূখি পদায়নের সুযোগ থাকবে। কর্মচারিদের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি করপোরেশন পর্যন্ত অভিগম্যতা থাকলে পদোন্নতি ও পদায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৬.৪ স্থানীয় সরকারের জন্য জাতীয় সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ছাড়াও জাতীয় সরকারের অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ সম্পর্কিত একটি গ্যারান্টি ক্লজ থাকলে স্থানীয় সরকারের আগাম উন্নয়ন পরিকল্পনা করা সহজতর হয়।

৪.৬.৫ পার্বত্য অঞ্চলে ভোটার তালিকার উপর একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্য একদিনে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে।

৪.৬.৬ একটি একক তফসিলে জাতীয় নির্বাচনের জন্য তৈরিকৃত ভোটার তালিকায় সম্ভাব্য ২০২৫ এ জাতীয় নির্বাচনের আগে বা যখন সরকার, নির্বাচন কমিশন ও অংশীজনরা চান তখনই স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৪.৬.৭ জুলাই গণঅভ্যুত্থান এর পরবর্তী সময়ে দেশে কার্যত কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নেই। এ মুহূর্তে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন একসাথে করা সম্ভব। বর্তমানে নতুন একটি স্বচ্ছ ক্যানভাসে নতুন ছবি আঁকা সম্ভব। নতুবা নির্বাচনের পূর্বে অনেক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আইনি জটিলতার উদ্ভব হতে পারে।

৪.৬.৮ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতি চালু করার আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে জনপরিসরে থাকলেও কোনো সুয়োগ সৃষ্টি হয়নি। এখন সে সুযোগ সৃস্টি হয়েছে। আগামী মার্চ/এপ্রিল ২০২৫ এর মধ্যে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ৫টি প্রতিষ্ঠানের জন্য দুটি একীভূত স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে আগামী জুন, ২০২৫ এর মধ্যে সকল সমতল ও পাহাড়ের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত 'স্থানীয় সরকার কমিশন' এ বিষয়ে বিস্তারিত কাজ এপ্রিল, ২০২৫ এর আগে সমাপ্ত করতে পারে। তবে জাতীয় নির্বাচনের বিষয়ে সরকার, রাজনৈতিক দল সমূহ এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে একটি ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হলেই তা সম্ভবপর হবে।

৪.৬.৯ একইভাবে, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে সংসদীয় কাঠামোতে সংস্থাপিত করে আইন সংশোধন করে জুন, ২০২৫ এর মধ্যে পাহাড়ের তিনটি জেলা পরিষদের নির্বাচনও সমাপ্ত হতে পারে।

৪.৬.১০ প্রতিটি ইউনিয়নে নূন্যতম ৯টি ওয়ার্ড এবং সর্বাধিক ৩০টি ওয়ার্ড হতে পারে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে ওয়ার্ড সংখ্যা নির্ধারিত হবে। প্রতিটি উপজেলা ও জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে। আর প্রতিটি ইউনিয়ন উপজেলার তিন থেকে পাঁচটি ওয়ার্ডে বিভক্ত হবে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার কোনো ওয়ার্ডের কোনো প্রশাসনিক ও নির্বাহী দাযিত্ব থাকবে না। ওয়ার্ড সদস্যগণ নিজ নিজ পরিষদ ও কাউন্সিলে বিধানিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.৬.১১ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের সাধারণ সদস্য নির্বাচনে সরকারি বেসরকারি যে কোনো কর্মচারি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে স্ব পদে থেকেও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। তবে চাকুরিরত কোনো সদস্য নির্বাচিত হলে পরিষদের সার্বক্ষণিক কোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। তিনি সাধারণ সভা বা অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবেই শুধু দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৪.৬.১২ প্রস্তাবিত নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার জন্য নিচের চিত্রসমূহ দেখা যেতে পারে। একই তফসিলে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন অংশগ্রহণ করবে। প্রতিজন ভোটার নিজ নিজ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটির ওয়ার্ডের জন্য একটি ব্যালট পেপার, উপজেলার জন্য একটি এবং জেলার জন্য একটি ব্যালট পেপার পাবেন। তিনটি ব্যালটে তিনটি বা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) একাধিক ভোট দিয়ে তাদের ভোট শেষ করবেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
উপজেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

পৌরসভা নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
উপজেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩
৪ ৫ ৬
৭ ৮ ৯
১০ ১১ ১২
১৩ ১৪ ১৫
১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১
২২ ২৩ ২৪
২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩
পৌরসভা
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

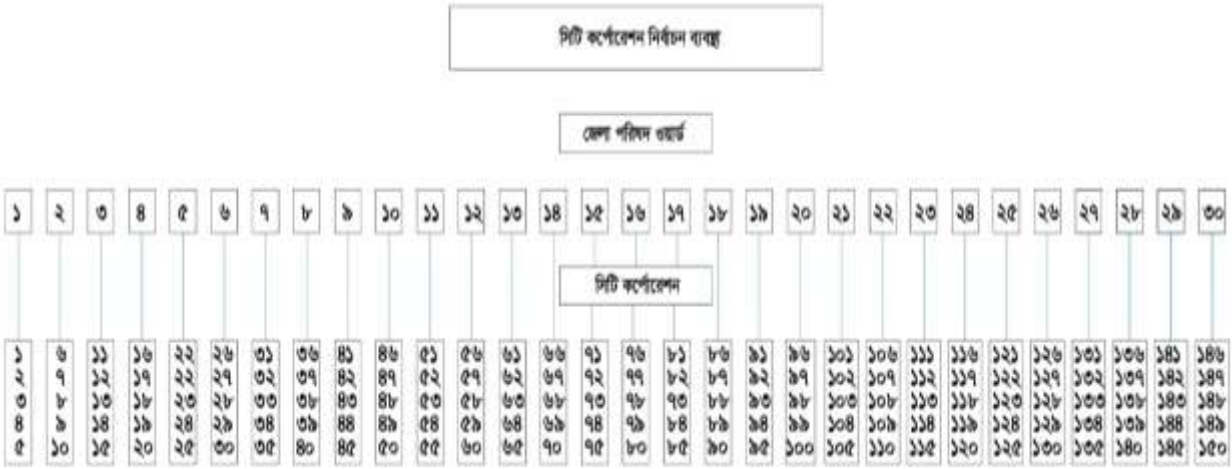
সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ব্যবস্থা
জেলা পরিষদ ওয়ার্ড
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০
সিটি কর্পোরেশন

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার

৫.১ পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি "বিশেষ অঞ্চল" হিসেবে ১৯০০ সনের পর থেকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ভৌগোলিক ভিন্নতা বিশেষতঃ পাহাড়-নদী এবং এখানে বাঙালীসহ মোট ১৩টি ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বসবাস। যাদের ভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রথা-রীতি-পদ্ধতি ও সামাজিক আচার-আচরণ রয়েছে।

৫.২ এই অঞ্চলে প্রথাগত হেডম্যান কারবারী-সার্কেল প্রধান, বাজার ফান্ড, সংবিধিবদ্ধ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ (বিশেষ আইনে গঠিত) এবং একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য তিন জেলা নিয়ে একটি 'আঞ্চলিক পরিষদ' রয়েছে। এ সাতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধুমাত্র "বাজার ফান্ড" প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করে বাকি ছয়টি প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখা যেতে পারে।

৫.৩ 'বাজার ফান্ড' প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে বাজার রাজস্ব আহরণের জন্য উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), সহকারী কমিশনার-ভূমি (এসিল্যান্ড) ও উপজেলা পরিষদ সভাপতির সভাপতিত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে মুক্তভাবে প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে এসব রাজস্ব একটি কেন্দ্রীয় তহবিলে স্থানান্তর করে তা ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা সার্কেল-চিফ ও জাতীয় সরকার এর মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী 'আনুপাতিক হারে' বণ্টন করা যেতে পারে।

৫.৪ পার্বত্য অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং-পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তরিত হতে পারে। 'স্থানীয় সরকার বিভাগ' প্রতিবছর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জাতীয় বাজেটের পার্বত্য অংশ ঐ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করে দিতে পারে।

৫.৫ ইউনিয়ন পরিষদসমূহের সাথে হেডম্যান করবারীদের একটি প্রশাসনিক সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে।

৫.৬ ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট অধিবেশনে হেডম্যানদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৫.৭ ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে একজন করে হেডম্যানকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৫.৮ উপজেলা পরিষদে ও পৌরসভায় হেডম্যান-কারবারীদের নিজ নিজ পরিষদ অধিভুক্ত এলাকা থেকে একজন নারী ও একজন পুরুষকে সহযোগী সদস্য হিসাবে যুক্ত হতে পারে।

৫.৯ জেলা পরিষদে স্ব-স্ব জেলার সার্কেল চিফগণ নিয়মিত সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন।

৫.১০ জেলা পরিষদ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ২০২৫ এর মধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করা যেতে পারে। এ আইনের সংশোধনী পৃথকভাবে সংযুক্ত করা হলো। কারণ ১৯৮৯ এর পর পার্বত্য জেলা পরিষদে কোনো নির্বাচন হয়নি। ফলে এ পরিষদটি রাজনৈতিক বৈধতা হারাতে বসেছে।

৫.১১ আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সংশোধন এবং নির্বাচন বিষয়ে পরবর্তী জাতীয় সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আপতত যেভাবে আছে তা চলতে পারে।

৫.১২ পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০২৬ সালের মধ্যে পৃথক জনবল, তিন স্তরে ভুমি জরীপ, ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক নাগরিক তথ্য-ভান্ডার তৈরি করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।

৫.১৩ যেসকল ক্ষেত্রে পাহড়ে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতীসত্বার অধিবাসীগণের জন্য ব্যবসা, নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর-মূসক মওকুফ করা আছে, তা প্রত্যাহার করে সমতলের মত কর-মূসক আরোপ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

এই মওকুফের কারণে দরিদ্র পাহাড়ী-বাঙালী কারও কোনো উপকার হচ্ছে না। একটি মধ্যস্বত্বভোগীর আত্মসাত প্রক্রিয়াকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হচ্ছে।

৫.১৪ কর, মূসক মওকুফ হলেও বে-আইনি চাঁদাবাজী পার্বত্য ট্রগ্রামের একটি নির্মম বাস্তবতা। এ চাঁদাবাজির সাথে প্রশাসন, রাজনৈতিক দলসমূহ ও নানা গোষ্ঠী এক ধরনের বন্দোবস্ত তৈরি করেছে। এ বন্দোবস্ত সাধারণভাবে দৃশ্যমান হলেও এখানে যাদের ব্যবস্থা নেয়ার কথা তারা চোখ বন্ধ করে রাখে। এ দুঃসহ অবস্থা ও ব্যবস্থা অবসানের জন্য ব্যাপক নাগরিক সংলাপ করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রেয়োজন।

৫.১৫ ব্যাপক কর্মসংস্থান, জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং সীমান্তের বাইরের নাশকতামূলক কর্মকান্ড ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হলে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা টেকসই হবার নয়। তাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতি গোষ্ঠির শাসন ও উন্নয়নে অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করাই হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল লক্ষ্য ও কাজ।

৬. স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা

৬.১ কমিশনের বিচার বিষয়ক প্রধান সুপারিশ হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া সারা দেশের সকল উপজেলায় আগামী দুই বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০২৬ সালের মধ্যে পূর্নাঙ্গ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করা।

৬.২ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের পাশাপাশি একই পদমর্যাদায় প্রতিটি উপজেলায় “বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্ত” (এডিআর) এর জন্য একজন সিনিয়র সহকারী জজ এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পূর্ণাঙ্গ কার্যালয় স্থাপন করা।

৬.৩ ইউনিয়ন পরিষদের অধীন “গ্রাম আদালত” বিলুপ্ত করে ওয়ার্ড পর্যায়ে সালিশি ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান এবং সালিশ সমূহের তত্ত্বাবধান, সালিশকারদের প্রশিক্ষণ ও সালিশের আপীল শুনানীর জন্য এডিআর আদালতের বিচারকের এখতিয়ার ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিত করা।

৬.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি উপজেলায় না হলেও প্রতিটি জেলায় অন্তত: তিনটি এডিআর পরিচালনার উপযোগী কাঠামো সৃষ্টি এবং এডিআর ম্যাজিস্ট্রেসেটর সাথে হেডম্যান-কারবারী ও ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড/গ্রাম ভিত্তিক সালিশের সংযোগ স্থাপন।

৬.৫ সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি অধ্যূষিত উপজেলাসমূহের এডিআর ম্যাজিস্ট্রেটের সালিশ তত্ত্বাবধান ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কমিউনিটি নেতৃত্ব পর্যন্ত তদারকি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

৬.৬ জেলা নয়, উপজেলাই হবে দেশের স্বীকৃত নিম্ন আদালত এবং জেলা হবে মধ্যবর্তী আদালত। জেলা জজ হবেন জেলা ও উপজেলা আদালতসমূহের তত্ত্বাবধায়ক।

৬.৭ উপজেলা পর্যায়ের বার এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠা ও উপজেলা বারের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য জাতীয় বার কাউন্সিল উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। সমতলের বাংলাদেশ, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ও সমতলের ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা অধ্যূষিত উপজেলা সমূহের নিম্ন আদালতও এডিআরের তিনটি সাংগঠনিক কাঠামো চিত্রে দেখানো হলো।

চিত্র-১ : সমতলের নিম্ন আদালত ও সালিশ ব্যবস্থা।

চিত্র-২ : পার্বত্য চট্টগ্রামের নিম্ন আদালত ও সালিশ ব্যবস্থা।

চিত্র-৩ : সমতলের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের সালিশ ব্যবস্থা।

বিচারিক কাঠামো-১
উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিচারিক কাঠামো
বাংলাদেশের সমতলের সকল উপজেলা এবং ইউনিয়ন
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

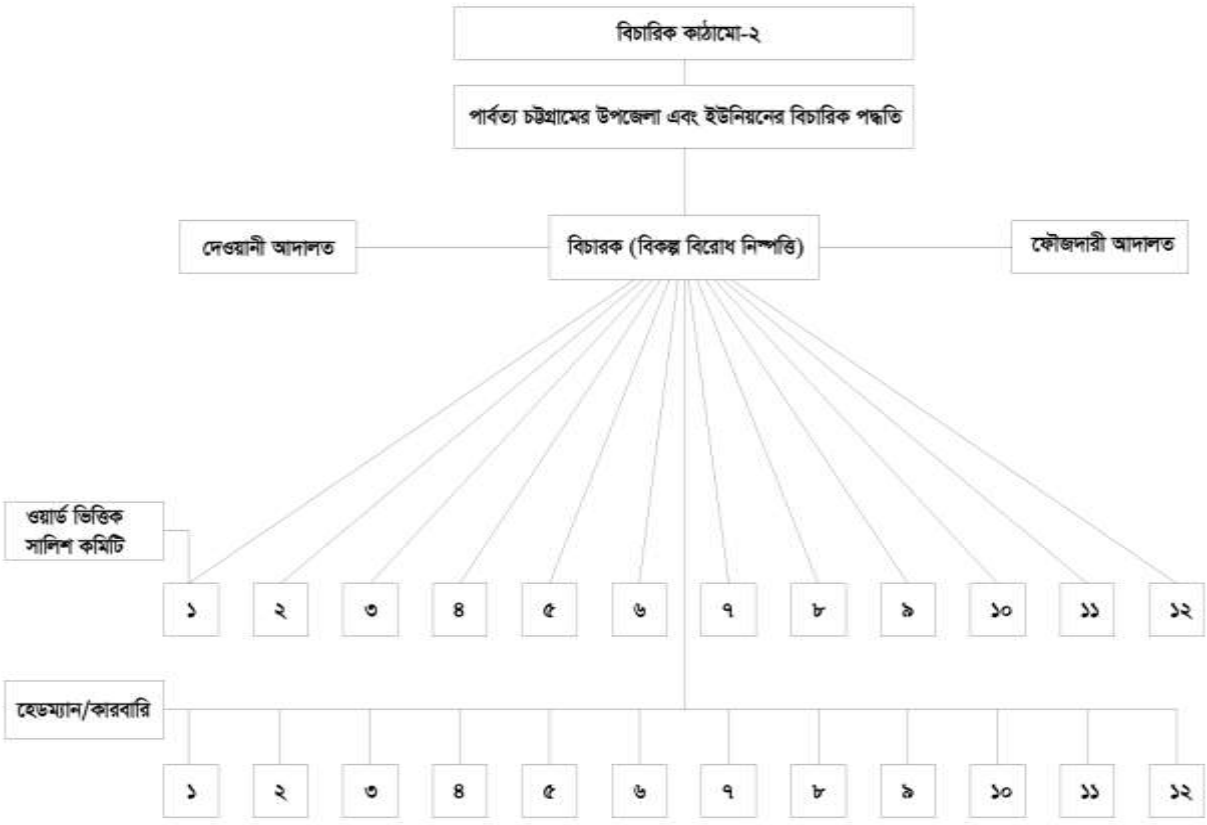
বিচারিক কাঠামো-২
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলা এবং ইউনিয়নের বিচারিক পদ্ধতি
দেওয়ানী আদালত
বিচারক (বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি)
ফৌজদারী আদালত
ওয়ার্ড ভিত্তিক সালিশ কমিটি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
হেডম্যান/কারবারি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

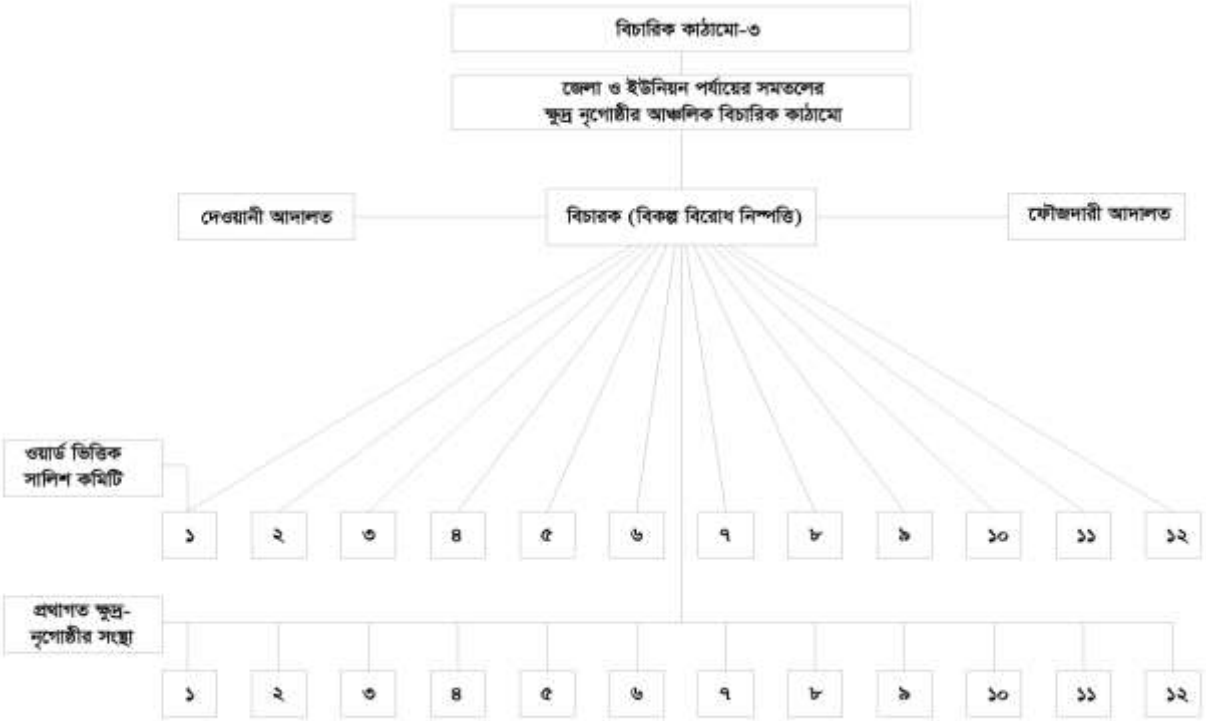

৭. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অর্থায়ন

৭.১ স্থানীয় কর রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারী হবে শুধুমাত্র স্থানীয় সরকারের তিনটি প্রতিষ্ঠান যথা ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।

৭.২ জেলা ও উপজেলা পরিষদ যথাযথ নিয়মে ফি, নিজস্ব সম্পত্তির আয় পাবে এবং সরকারি অর্থ সহায়তায় তাদের কার্যনির্বাহ করবে।

৭.৩ স্থানীয় সরকারের বর্তমান অর্থায়ন ব্যবস্থায় অস্বচ্ছতা ও নানা বৈষম্য এবং তদবির নির্ভর দুর্নীতি রয়েছে। তা দূর করার জন্য কর রাজস্ব, সরকারি অনুদান বা হস্তান্তর, প্রকল্পভিত্তিক অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহায়তা নীতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হবে।

৭.৪ দেশি-বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মধ্যে নগর ও গ্রামের বিভিন্ন সেবা-পরিষেবার প্রতি পক্ষপাত রয়েছে। সারা দেশই এখন এক অর্থে নগর। তাই বিশেষ সুযোগ সুবিধার পকেট বা প্রকোষ্ট সৃষ্টির অবকাশ বন্ধ করে প্রকল্প অর্থায়নে সমতা ও প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৭.৫ বিদেশি সরকার বা বহুজাতিক সংস্থা থেকে উন্নয়ন প্রকল্প ধারণা জন্ম হওয়া সঙ্গত নয়। মাঠ পর্যায় থেকে প্রকল্প ধারণা আসতে হবে। স্থানীয় সরকার সংস্থা ও জাতীয় সরকার তা অর্থায়নের জন্য সরকার ও কমিশনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি সংস্থার নিকট পাঠাবে।

৭.৬ অনুদান ও বিশেষ বরাদ্দ প্রথা বন্ধ করে জাতীয় সরকারকে প্রতি বছরে আহরিত কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রভৃতি সকল খাতের প্রাপ্ত মোট অর্থের এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দের জন্য সুপারিশ করা হলো যা কোনো অনুদান নয়, বরং প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানের ভিত্তিতে অংশীদারীত্ব বা পাওনা হিসেবে গণ্য হবে।

৭.৭ জাতীয় পরিকল্পনা কৌশলের সাথে একাত্ম হয়ে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ এ অর্থসম্পদ ব্যবহার করে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ নিজ নিজ অবস্থান

থেকে জাতীয় লক্ষ্যমাত্র পূরণের লক্ষ্যে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। তবে জেলা পরিষদ হবে স্থানীয় পরিকল্পনার মূল কেন্দ্রবিন্দু।

৭.৮ আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে সমন্বিত জেলা পরিকল্পনা ও জেলা বাজেটের একটি রূপকল্প তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কমিশন সরকারকে এ বিষয়ে সহায়তা করবে।

৭.৯ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় পরিকল্পনাবিদ এবং অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের চাকুরি পরিষদে ন্যস্ত থাকবে।

৭.১০ প্রতিটি স্থানীয় পরিকল্পনা ও বাজেটের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য যথাযথ প্রশাসনিক কাঠামো থাকবে এবং ফাইন্যান্সিয়াল অডিট ও পারফরমেন্স অডিট ব্যবস্থা স্থাপিত হবে। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭.১১ স্থানীয় সরকারকে কর আদায়ের আরো বিস্তৃত ক্ষমতা দিতে হবে। বাড়ি বা ব্যবসায়ের পাশাপাশি তারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর আদায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে এনবিআর থেকে আদায়কৃত করের একটি অংশ পেতে পারে। এজন্য স্থানীয় সরকারের কর সংক্রান্ত তফসিলে সংশোধনী আনতে হবে। পর্যটন-সমৃদ্ধ এলাকায় “পর্যটন কর” আরোপের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। হোল্ডিং কর সংগ্রহ না করাকে বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। একাধিক্রমে তিন অর্থবছরে কর পরিশোধের উপযুক্ত অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ বাড়ি থেকে হোল্ডিং কর আদায় না করতে পারলে ওই পরিষদে স্থানান্তর ও উন্নয়ন সহায়তা স্থগিত করতে হবে।

৭.১২ স্থানীয় সরকারের এলাকায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে এমন যন্ত্রপাতি ও যানবাহন, প্রাকৃতিক কাঠ ব্যবহার (পুনরুৎপাদন ব্যতীত) করে এমন পেশা ও ব্যবসায়, পরিবেশগত ঝুঁকি সৃষ্টিকারী যে কোনো পেশা ও ব্যবসায়, নিজস্ব ব্যবহারের জন্য যেকোনো পণ্য ও সেবা যা পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি তৈরি করে তার উপর পরিবেশ কর আরোপ করা যেতে পারে।

৭.১৩ পরিবেশ ও স্থানীয় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবেচনায় স্থানীয় সরকারের আওতাধীন এলাকায় বেসরকারি/ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে কোনো ধরনের ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের উপর কর ধার্য করতে হবে।

৭.১৪ নিকাহ নিবন্ধন ফি সমান তিনভাগে ভাগ করে স্থানীয় সরকার, নিকাহ নিবন্ধক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বন্টিত হবে। এতে করে নিবন্ধকগণ যেমন জবাবদিহির আওতায় আসবেন, তেমনি একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকায়, বিশেষ করে ইউনিয়ন, পৌর ও সিটি এলাকায় বিবাহের সঠিক সংখ্যা জানা যাবে এবং বাল্যবিবাহ রোধ করতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণও সম্ভব হবে।

৭.১৫ এক দশকেরও বেশি সময় আগে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার জন্য প্রণীত মডেল কর তফসিল মূল্য সূচকের সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ করতে হবে।

৭.১৬ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অর্থায়নের সূচক (Financing Index) তৈরি করে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে অর্থায়নের করতে হবে। প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কমিশন অর্থায়নের বিজ্ঞানভিত্তিক সূচক তৈরি করে কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কতটুকু অর্থায়ন করা হবে তা পরামর্শ আকারে স্থানীয় সরকার কমিশন/সরকারের কাছে উপস্থাপন করবে।

৮. স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন

৮.১ অবিলম্বে পাঁচ-সদস্য বিশিষ্ট সাংবিধানিক মর্যাদাসম্পন্ন একটি স্থায়ী **"স্থানীয় সরকার কমিশন"** গঠন করার সুপারিশ করা হলো।

৮.২ ইতোপূর্বে গঠিত নাজমুল হুদা কমিশন, রহমত আলী কমিশন এবং শওকত আলী কমিশন একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছিল। ২০০৮ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার মরহুম ফয়জুর রাজ্জাককে চেয়ারম্যান এবং মরহুম হেদায়াতুল ইসলাম চৌধুরী ও ড. তোফায়েল আহমেদকে সদস্য করে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ঐ অধ্যাদেশ অনুমোদন না করায় কমিশনটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই ২০২৫ সালের মধ্যে স্থানীয় সরকার কমিশন পুনরায় গঠিত হলে স্থানীয় সরকার সংস্কারের সুপারিশসমূহ সুসংহতভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি লাভ করতে পারে।

৮.৩ স্থানীয় সরকার কমিশনসহ স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত সকল সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে "স্থানীয় সরকার কমিশন" দীর্ঘমেয়াদে সরকারকে যথাযথভাবে সকল আইন, বিধি, নিয়মকানুন ধারাবাহিক ভাবে আইনানুগ পন্থায় প্রস্তুত করতে সহায়তা করতে পারবে।

৮.৪ "স্থানীয় সরকার কমিশন" সকল সংস্কারকর্মের একটি ধারাবাহিকতা রক্ষায় সক্ষম হবে। কমিশন, স্থানীয় সরকার অর্থায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও আইনের আওতায় আমলাতন্ত্র এবং জনপ্রতিনিধিদের সমানভাবে বিচার বিবেচনা করে আইনের শাসন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষার একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে।

৯. স্থানীয় সরকার সার্ভিস কাঠামো

৯.১ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ পর্যায়ে দুই ধরনের জনবল এর পৃথক দু'টি কাঠামো আপাতত কাজ করবে।

৯.২ স্ব-স্ব স্তরে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ (Functionary), তাদের সকল কার্যাদি (Function) এবং তাদের সকল সরকারি অর্থসম্পদ (Fund) প্রেষণকালীন সময়ে স্ব-স্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীন ন্যস্ত থাকবে। তবে তাদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, পুরুস্কার ও তিরস্কার স্ব-স্ব বিভাগের সরকারি নিয়মানুযায়ী হবে। কিন্তু তাদের সমস্ত কার্যাদি স্থানীয় পরিষদের নির্দেশনায় পরিচালিত হবে। প্রেষণকালীন সময়ে অফিস প্রধানের "বাৎসরিক কার্য প্রতিবেদন" স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান কর্তৃক লিখিত হবে। এ প্রতিবেদন তাদের ভবিষ্যত কর্মজীবনের রেকর্ডের অংশ হয়ে থাকবে।

৯.৩ এসব প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োজিত থাকবে। তারা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সরকারের কর্মী হিসাবে বিবেচিত হবে। তারা সুনির্দিষ্ট একটি সার্ভিস নীতিমালা অনুযায়ী নতুনভাবে নিয়োজিত বা ইতোপূর্বে নিয়োজিতরা এ সার্ভিসে আত্মীকৃত হবে।

৯.৪ এ সার্ভিসটির নাম হবে "স্থানীয় সরকার সার্ভিস" স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ শাখা তাদের সংস্থাপন বিভাগ হিসাবে কাজ করবে।

৯.৫ প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এ সার্ভিসের কর্মকর্তা, কর্মচারি সংখ্যা, তাদের বিশেষায়ন, নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, পুরস্কার তিরস্কার, অবসর ইত্যাদি নীতি নির্ধারণ ও পদ সংখ্যা নিরুপন করবে।

৯.৬ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি রয়েছে তারা স্থানীয় সরকার সার্ভিসের অর্ন্তভূক্ত হবে।

৯.৭ এ সার্ভিসের অর্ন্তভূক্ত কর্মকর্তা-কার্মচারিদের গতিবিধি ও পদায়ন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৯.৮ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখার মাধ্যমে নিয়োগ হলেও অফিসার পদমর্যাদার নানা পদের কর্মচারিগণ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্যাডার ভিত্তিক নিয়োগের পর নন-ক্যাডার পদের জন্য বিবেচিত উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই ও নিয়োগ করা যেতে পারে।

৯.৯ কর্মজীবনে এসব কর্মকর্তাগণ যোগ্যতা, দক্ষতা এবং পদ থাকা সাপেক্ষে বেতনক্রমের সর্বোচ্চ তৃতীয় গ্রেড পর্যন্ত উত্তীর্ণ হতে পারবে।

৯.১০ এই সার্ভিসের অর্থাৎ স্থানীয় সরকার সার্ভিসের সদস্যগণের আর্থিক ব্যয় বহনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি তহবিলে আইন নির্ধারিত পন্থায় নিজস্ব অংশ জমাদান নিশ্চিত করবে। কিন্তু কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ভাতা ও অবসরকালীন ভাতাদি সরকারের কেন্দ্রিয় তহবিলের মাধ্যমে নির্বাহ করা হবে।

৯.১১ স্থানীয় সরকার সার্ভিসের ব্যয় নির্বাহের একটি তহবিল সরকার ও অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে। এ তহবিলে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী নির্ধারিত একটি হারে অর্থ জমা করবে। সরকার অন্তত মোট তহবিলের ৫০% অর্থ প্রদান করবে।

৯.১২ ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং পৌর পুলিশ বাহিনীর চাকুরী একটি নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর অধীনে স্থানীয় সরকার সার্ভিসের অর্ন্তভূক্ত হবে। নিয়মিত পুলিশ ক্যাডারের এডিশনাল আইজি পদ মর্যদার একজন অফিসার স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা বা বিভাগের অংশ হিসাবে এ পুলিশ বাহিনীর প্রশাসন, শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ তদারকী করবে।

৯.১৩ গ্রাম পুলিশ ও পৌর পুলিশ পূর্নাঙ্গভাবে গঠিত হবার পর “কমিউনিটি পুলিশ” নামক সংগঠন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৯.১৪ স্থানীয় সরকার পুলিশ বাহিনী পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ যথাযথ বিধি প্রণয়ন করবে। নতুন বিধি অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের পুলিশ বাহিনী পুর্নগঠিত হবে।

১০. স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন

স্থানীয় সরকারের সকল কার্যক্রম, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, আর্থিক অডিট, পারফরমেন্স অডিট ও কমপ্লায়ন্স অডিট পরিচালনার জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন করতে হবে যার মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ হবে:

১০.১ স্থানীয় সরকার বিভাগে বর্তমানে কার্যরত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিদপ্তরকে অধিকতর শক্তিশালী করে একটি পুনর্গঠিত একটি নতুন অধিদপ্তর গঠন করার সুপারিশ করা হলো।

১০.২ এই অধিদপ্তরে পেশাদার আমলার সাথে আর্থিক নিরীক্ষা, পারফরমেন্স অডিট, কমপ্লায়েন্স অডিট, মনিটরিং ও প্রকল্প কর্ম মূল্যায়নের দক্ষতা সম্পন্ন পেশাজীবী নিয়োগ করা হবে।

১০.৩ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম এ অধিদপ্তরের আওতাধীন হবে।

১০.৪ স্থানীয় সরকার কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় আইন কানুনের খসড়া তৈরি করবে।

১০.৫ বিভাগীয় কমিশনার অফিসের পরিচালক স্থানীয় সরকার এবং ডেপুটি কমিশনার অফিসের সাথে সংযুক্ত উপপরিচালক স্থানীয় সরকারের পদসমূহ বিলুপ্ত হবে। একজন উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার অধীনে অনুন্য ১০ জনের একটি সংগঠন উপরে বিবৃত অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিটি জেলায় কাজ করবে।

১০.৬ এ অধিদপ্তর সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় ও সেবা কর্মের উপর প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

১১. স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের পুর্নগঠনের সুপারিশ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বর্তমান স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পর্যায়ে সংস্কার ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগসমূহ, অধিদপ্তর, দপ্তর সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

১১.১ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তিত হয়ে তা হতে পারে **'স্থানীয় সরকার, জনসংগঠন ও জনপ্রকৌশল সেবা'** মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের দুইটি বিভাগের পুনর্গঠন ও নামকরণ নিম্নরুপ পরিবর্তন হতে পারে:-

মন্ত্রী
প্রতিমন্ত্রী
উপ-মন্ত্রী

১। স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিষ্ঠান বিভাগ (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সমবায়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সকল এনজিওসমূহ (Non-Government Organization) এই বিভাগের অধীনে আসতে পারে)	**২। জনপ্রকৌশল ও সেবা বিভাগ (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, এলজিইডি, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ওয়াসাসমূহ এই বিভাগের অধীনে থাকতে পারে)**
সিনিয়র সচিব-১ অতিঃসচিব-১ যুগ্মসচিব-৪ উপ-সচিব-৮ সিনিয়র সহকারী সচিব-৮ সহকারী সচিব-৮	সিনিয়র সচিব-১ অতিঃসচিব-১ যুগ্মসচিব-৪ উপ সচিব-৮ সিনিয়র সহকারী সচিব-৮ সহকারী সচিব-৮
পরিকল্পনা কোষ অর্থ অনুবিভাগ বাজেট অনুবিভাগ প্রশাসন	পরিকল্পনা কোষ অর্থ অনুবিভাগ বাজেট অনুবিভাগ প্রশাসন
১। দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমুহের দায়িত্ব এই বিভাগের থাকবে। ২। দেশের সমবায়, পল্লী উন্নয়ন ও সকল সমষ্টিক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল তথা এজিওসমূহ এই বিভাগের অধীনে থাকবে।	১। এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দেশের সকল ওয়াসা কার্যালয়সমূহের কাজ। ২। বড় ও মাঝারি শহরের অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরের বাইরের সারাদেশের ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ৩। দালান ও ইমারত নির্মাণ পরিকল্পনা ও নকশা পাশ করার ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা দান এবং গ্রাম শহর রূপান্তর প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা।

৩। স্থানীয় সরকারের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, আর্থিক কার্যক্রম, কমপ্লায়েন্স অডিট অধিদপ্তর এই বিভাগের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান হবে। ৪। দেশের সকল প্রকারের এনজিও সমূহ যারা এনজিও ব্যুরো ও এম আর এ এর সাথে সংযুক্ত, সে সংযুক্তি অব্যাহত রেখেও মন্ত্রণালয়ের এ বিভাগের সাথে যুক্ত থাকবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত থাকার চেয়ে একটি জন উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত থাকা অধিক যুক্তিসঙ্গত। এ বিভাগের অধীন অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ: ১। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট। ২। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী। ৩। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ও বাপার্ডসহ অন্যান্য সকল পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ৪। বিআরডিবি ৫। সমবায় অধিদপ্তর ৬। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৭। মিল্ক ভিটাসহ অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।	৪। জলাবদ্ধতা, স্থানীয় বন্যা, পয়:বর্জ্যনিস্কাশন পরিকল্পনা, বাজার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৫। নিরাপদ পানীয় জল, ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের সংরক্ষণ উন্নয়ন ও ব্যবহার। ৬। আঞ্চলিক ও স্থানীয় সড়ক ও নৌ যোগাযোগ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ। ৭। ভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার,প্রস্তাবিত জাতীয় ভৌত অবকাঠামো আইন ও ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা অনুয়ায়ী স্থানীয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা।
<u>প্রতিষ্ঠান পুর্নগঠন সংক্রান্ত সুপারিশ</u> ১। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার বর্তমান পরিচালনা পদ্ধতি ও কার্যক্রম একই রকম থাকতে পারে। ২। গোপালগঞ্জের বাপার্ড, রংপুর, গাইবান্ধা, শেরপুরের একাডেমীসমূহকে কোনো কারীগরী প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ মেয়াদে লিজ দেয়া যেতে পারে। সরকারের পক্ষে এসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব হবে বলে মনে না হলে এমনকি বাজার মুল্যে বিক্রি করে দেয়া যেতে পারে। ৩। এনআইএলজি'র ব্যাপক পুনর্গঠন ও সংস্কার প্রয়োজন। এ বিষয়ে পৃথকভাবে একটি প্রস্তাব সংযুক্ত হবে। ৪। দেশে সমবায়ের নিবন্ধন, উন্নয়ন ও সমবায় সংশ্লিস্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিআরডিবি ও সমবায় অধিদপ্তর আলাদা দু'টি প্রতিষ্ঠান সরকারি রাজস্বের অধীনে রাখার যুক্তি নেই। ৫। সমবায় ক্যাডার বিলুপ্ত করে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি একীভূত করে একটি স্বায়ত্বসাশিত পেশাদার সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলা যায়। জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে	**<u>এলজিইডি ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের একত্রিকরণ</u>** ১। একটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে দুইটি পৃথক প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান থাকা বাঞ্চনীয় নয়। কর্ম এলাকা বিভাজন এবং চাকুরী কাঠামোর সুসম যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একীভূত হলে জাতি প্রভূত উপকৃত হবে। ২। জাতীয় থেকে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকৌশল দপ্তর থাকবে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামো যথা সড়ক, পয়বর্জ্য নিস্কাশন, জলাবদ্ধতা, আকস্মিক বন্যা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক ইমারত, ভবন, ব্রীজ, কালভার্ট প্রভৃতির নির্মাণ নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়ায় এই প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রধান কারীগরী ভূমিকা পালন করবে। নবগঠিত এ প্রকৌশল দপ্তরের কারীগরী সহায়তায় ভূমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি জমি, বনভূমি, জলাভূমি, খাস জমির উপর সকল নির্মাণ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে এবং

একই প্রশাসনের অধীনে এনে সমবায়কে গুরুত্ব দিয়ে এ একীভূত প্রতিষ্ঠানটি কাজ করবে। ৬। সমবায় সংগঠন ও উন্নয়নে কোনো ক্যাডার সার্ভিসের প্রয়োজন নেই। সমবায় ক্যাডারকে অন্য সুবিধাজনক কোনো ক্যাডারের সাথে একীভূত করে ভবিষ্যতে এ ক্যাডার বিলুপ্ত করা যেতে পারে। ৬। সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি দু'টি প্রতিষ্ঠানের চাকুরী কাঠামোর যৌক্তিক সুষমকরণ করে একটি নতুন নাম দিয়ে সমবায়ের একটি পেশাদার স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি গড়ে উঠবে। ৮। সমবায়কে সহায়তার জন্য সমবায় সেক্টরের একটি পূর্ণাঙ্গ তফসিলী ব্যাংক স্থাপন করা যায়। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত কিছু কর্মকর্তা কর্মচারিকে প্রশিক্ষিত করে নবগঠিত সমবায় ব্যাংকে আত্মীকরণ করা যাবে। ৯। এ সমবায় ব্যাংক সমবায়ীদের পুঁজি ও ইকুয়িটি দিয়েই শুরু হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ বছর মেয়াদী স্বল্পসুদে কিছু ঋন দিয়ে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করতে পারে। ১০। পেশাদার ব্যাংকার দিয়ে সমবায়ীদের এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হবে। ১১। একটি পেশাদার ব্যাংক স্থাপনে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী এনজিওসমূহও এ ব্যাংক গঠনে অংশগ্রহন করতে পারে।	অন্যান্য সকল নির্মানকাজের পরিকল্পনা অনুমোদিত হতে হবে। ৩। এলজিইডি অধিদপ্তর হলেও কোনো প্রকৌশল ক্যাডারের অর্ন্তভূক্ত নয়, একটি পৃথক ক্যাডার হবার সকল শর্ত এলজিইডি পুরণ করে। এ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের ক্যাডারভুক্ত করলে সরকারের কোনো ব্যয় বৃদ্ধি হবে না। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল যেহেতু ক্যাডার ভুক্ত; দুইটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করলে এলজিইডিকে ক্যাডারভুক্ত করে নিতে হবে। ৪। ঋতু বৈচিত্রের জন্য ক্ষতিকর ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে কোনো ভৌত অবকাঠামোর পরিকল্পনার নকশা অনুমোদিত হবে না। ৫। দেশের সকল ওয়াসাসমূহের বোর্ড পুনর্গঠন করে ব্যবহারকারীদের কাছে ওয়াসাগুলোকে জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে। ৬। পানি অপচয় বা সিষ্টেম লস কমিয়ে পানির মূল্য স্তরকে সবার জন্য সহনীয় যেমন রাখতে হবে, তেমনিভাবে পানিকে সবার জন্য অবারিত ও সহজলভ্য করতে হবে। বেশী বিল দিলে বেশী পানি ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। পানি ব্যবহারের মাথাপিছু পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। ৭। পরিবার পিছু পানি ব্যবহারের সর্বোচ্চ সিলিং ধার্য করতে হবে।

১২. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ

১২.১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন্যান্য সরকারি বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে পানি সম্পদ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ উপযোগী কোনো কর্মচারি বা লজিস্টিক নাই। তাই জেলা ও উপজেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা ও কার্যালয় স্থাপন প্রয়োজন।

১২.২ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তাই জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের উপযুক্ত পদ মর্যাদার কর্মচারি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পদায়ন করতে হবে। তারা কর্মকালীন সময়ে ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ন্যাস্ত কর্মচারি হিসাবে পদায়িত হবে।

১২.৩ জেলা, উপজেলা ও পৌরসভায় পরিকল্পনাবিদ ও অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং এ পদসমূহ **'স্থানীয় সরকার সার্ভিস'র** অন্তর্ভূক্ত হবে।

১৩. অন্যান্য কমিশনসমূহের সুপারিশ

ইতোমধ্যে যে ৬টি কমিশন প্রতিবেদন পেশ করেছে তাদের কতিপয় বিষয় স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ যা এ কমিশনের সুপারিশসমূহকে অধিকতর জোরালো করেছে।

১৩.১ **বিচার ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন:** উপজেলা পর্যায়ে পুর্ণাঙ্গ দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির আদালত স্থাপন ও বিচারক নিয়োগের জন্য এ কমিশনের সুপারিশ করেছে।

১৩.২ **জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন:**

(ক) মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধস্তন দপ্তরের সংখ্যা হ্রাস ও একই কাজ ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর যে ক্ষেত্রে করছে তাদের একত্রীকরণ সুপারিশ করা হয়েছে।

(খ) চেয়ারম্যান ও মেয়র নির্বাচন সরাসরি না করে পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করার সুপারিশ করা হয়েছে।

(গ) রাজধানীসহ বড় শহরের জন্য নগর ব্যবস্থাপনার নতুন ধরনের নগর সরকার সৃষ্টিরও একটি সুপারিশ রয়েছে।

১৩.৩ **সংবিধান সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি বিষয়ক সংস্কার কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন** বর্তমান ও পূর্বের অন্যান্য কমিশনের সুপারিশের সাথে **স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন** গঠনের জন্য স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনও ঐক্যমত্য পোষণ করে।

১৩.৪ ইতোপূর্বে গঠিত নাজমুল হুদা কমিশন (১৯৯১), রহমত আলী কমিশন (১৯৯৭) এবং শওকত আলী কমিশন (২০০৮) যেমন সুপারিশ করেছিল বর্তমান সময়ের চারটি কমিশন সাংবিধানিক মর্যাদা সম্পন্ন "স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন" গঠনের সুপারিশ করেছে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন এ সুপারিশের সাথে একমত এবং এ লক্ষ্যে একটি আইনের খসড়া প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করছে।

১৩.৫ **"স্থানীয় সরকার কমিশন"** আগামী তিন মাসের মধ্যে গঠিত হলে এ কমিশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সকল অত্যাবশ্যকীয় ও সুদূর প্রসারি পরিবর্তনসমূহ সরকারের সাথে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

১৩.৬ এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর মাধ্যমে পরিচালিত জাতীয় জরীপে যে চলকগুলো অন্যান্য কমিশন তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রহন করেছে তার পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন সে চলকের উপর প্রশ্নমালা অন্তর্ভূক্ত করেনি। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশনের জরীপের কিছু ফলাফলে ভিত্তিতে করা সুপারিশের সাথে এ কমিশন একমত।

১৪. বিবিধ

১৪.১ স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিধিদের শিক্ষা ও সততা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর উদ্বিগ্নতা ও প্রশ্ন বিদ্যমান। শিক্ষা ও সততা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা/অযোগ্যতার মাপকাঠি বিবেচনা বেশ কষ্টসাধ্য হলেও বিষয়টি জনসাধারণের নিকট একটি দুশ্চিন্তার বিষয় হিসাবে দেখা যায়।

১৪.২ জাতীয় সংসদ সদস্যগণের কার্যকর ভূমিকাকে সংসদীয় প্রক্রিয়ার বাইরে না আনার বিষয়ে দেশবাশীর মধ্যে প্রবল উদ্বেগ লক্ষ্য করা গেছে। জনসাধারণ আশা করে উচ্চ কক্ষ, নিম্নকক্ষ এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে জাতীয় সংসদের সকল সদস্য স্থানীয় সরকারের নানা প্রকল্প ও সেবা, কোনো সরকারি নির্মাণ ঠিকাদারী, সরবরাহ ঠিকাদারী, বেআইনি তদবির এবং যে কোনো রকম আইন ভঙ্গের দায় থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মনযোগী হবেন।

১৪.৩ কোনো প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বা সরকারি কর্মকর্তা জমি, জলা-বন ইত্যাদি দখল বেদখল কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হবেন না।

১৪.৪ কোনো জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে উপরের অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হলে তা স্ব স্ব পরিষদ বা সংসদে বিশেষ এজেন্ডা হিসাবে আলোচিত হবে এবং কোনোরুপ বেআইনি সংশ্রব পাওয়া গেলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং আইননানুগভাবে দুদক, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে মামলা রজুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৪.৫ স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি 'কোড অব কন্ডাক্ট' তৈরি করতে হবে। প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কমিশন এ বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তুত করবে। কোনো নির্বাচিত সদস্য, নির্বাহী বা অন্য কোনো পদধারী তা ভঙ্গ করলে শাস্তির আওতায় আনার বিধান থাকবে।

অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ, পিএইচডি
কমিশন প্রধান
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

অধ্যাপক ফেরদৌস আরফিনা ওসমান, পিএইচডি
সদস্য
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

আবদুর রহমান
সদস্য
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

ড. মাহফুজ কবীর
সদস্য
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

মাশহুদা খাতুন শেফালী
সদস্য
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

অধ্যাপক মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, পিএইচডি
সদস্য
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

ইলিরা দেওয়ান
সদস্য
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

অধ্যাপক কাজী মারুফুল ইসলাম, পিএইচডি
সদস্য
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

[অন্যান্য অধ্যায়গুলো পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকবে]

অধ্যায়-৪

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা, প্রচলিত আইন ও সংগঠনসমূহের আশু সংস্কারের সাথে সুষ্ঠু, অবাধ, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী নির্বাচন ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে কিছু সুপারিশ

সূচনা বক্তব্য: স্থানীয় সরকার এদেশের এক গুচ্ছ অতি পুরানো শাসন, সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি। স্থানীয় সরকার বিধিবদ্ধ আইনী প্রতিষ্ঠান হলেও এ প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত আইনের চেয়ে নিজস্ব প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণ করেই চলে। নির্বাচন ও কার্যপদ্ধতি ছিল অস্বচ্ছ। গণতন্ত্র ও জনজবাবদিহিতা নানাভাবে আড়স্ট। অর্থ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ফলে সেবা ও উন্নয়ন যা হয় তা নাম মাত্র। বিগত ১৫ বছরের একতরফা নির্বাচনের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো গণবৈধতা পায়নি। ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতিতে প্রতিষ্ঠানগুলো আকন্ঠ নিমজ্জিত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নানামূখি সংস্কারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ১৯৮১ সনের পর থেকে গঠিত হয় পাঁচটি সংস্কার কমিটি ও কমিশন। কিন্তু এসব কমিটি ও কমিশনের সুপারিশসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে দিনে দিনে সমস্যার পাহাড় সৃস্টি হয়েছে।

একটি দেশ ও সমাজে কার্যকর স্থানীয় সরকার তৃণমূল থেকে গণতন্ত্রকে সুসংহত করে। সাধারণ মানুষ সুশাসনের অংশীদার হয়। উন্নয়ন ও সেবা ব্যয় সাশ্রয়ী ও মান সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সরকার স্থানীয় সাধারণ মানুষের জন্য গণতন্ত্র চর্চার 'প্রাথমিক পাঠশাল'। এখানে গণতন্ত্র চর্চা জাতীয় গণতন্ত্রকে সুসংহত করে। সবকিছু মিলিয়ে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের উপ-ব্যবস্থা (Sub-System) হিসাবে স্থানীয় সরকারের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

দেশের সামগ্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সরকার একটি পৃথক কমিশন গঠন করেছে। সে কমিশন স্থানীয় সরকারের ওপর বিস্তরিত সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের সাথে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন ও স্থানীয় সরকার কেন্দ্রিক নির্বাচনের বিস্তারিত সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। সে বিষয়ের কিছু বিশ্লেষণসহ সুপারিশসমূহ পেশ করা হলো।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সমস্যার মূল ও তার বিস্তার: সংবিধানের ১১৯(১) এর অধীনে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র জাতীয় নির্বাচনসমূহ নির্বাহের জন্য গঠিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১১৯(২) অনুসারে নির্বাচন কমিশন সরকার কর্তৃক আদিস্ট বা অনুরুদ্ধ হয়ে 'নির্ধারিত দায়িত্বের অতিরিক্ত' হিসাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। সাতটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করেপোরেশন এবং পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ তিনটি জেলা পরিষদ ও তিন জেলা নিয়ে গঠিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' সমূহ সাতটি ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। আবার ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনগুলোও পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নানা কারণে সকল নির্বাচন সময় মত অনুষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় নির্বাচন পাঁচ বছরে একবার একটি তফসিলের মাধমে অনুষ্ঠান সম্ভব হলেও স্থানীয় নির্বাচনসমূহ একটি সরকারের পুরো পাঁচ বছর সময়কাল ধরে অন্তত সাতটি বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন তফসিলে অনুষ্ঠিত হয়। আবার ১২টি সিটি কর্পোরেশন ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদ শেষে তাদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে। অন্যদিকে মামলা মোকাদ্দমার কারণে স্থগিত নির্বাচনসমূহ বিভিন্ন অনির্ধারিত সময়ে তফসিল ঘোষণা দিয়ে অনুষ্ঠান করতে হয়। ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা এ তিনটি নির্বাচনের আয়োজনের বহর ও বিস্তৃতি তিনটি জাতীয় নির্বাচনকেও হার মানায়। অতীতে এ তিনটি

নির্বাচনে শত শত মানুষ নিহত এবং হাজার মানুষ আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। এভাবে পৃথক সাতটি নির্বাচন ও নানা সময়ে পৃথকভাবে সিটি নির্বাচন ও স্থগিত নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠান অনেক ব্যয় বহুল, সময়ক্ষেপণকারী এবং প্রশাসনিকভাবে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। একটি সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদের প্রতিবছরই এক বা একাধিক নির্বাচন হতে থাকে । তাতে প্রচুর কর্মদিবস নষ্ট হয়। সারা দেশ নির্বাচনী ডামাডোলে অস্থির হয়ে পড়ে।

সংবিধানের ৫৯(২) এর সুযোগে "সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন সেভাবে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ও কার্যক্রম নির্ধারণ হইবে" এ বিধিবিধানের সুযোগে বা অপব্যবহারের কারণে স্থানীয় সরকারের কাঠামো-কার্য নির্ধারণে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গঠনকাল, গঠনকাঠামো, নির্বাচন ও কার্যক্রম ভিন্ন। তাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন কাজ করতে সমস্যায় পড়ে, তেমনি নির্বাচনও হয়ে পড়ে দীর্ঘ একটি প্রলম্বিত প্রক্রিয়া, ব্যয়বহুল ও সন্ত্রাসপ্রবণ। এ জন্য স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অংশ ৫৯ ও ৬০ এবং নির্বাচন সংশ্লিস্ট বিধানের ১১৮ ও ১১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধনী প্রয়োজন। সাথে প্রয়োজন গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করে স্থানীয় সরকার আইন কাঠামোকে স্থিতিশীল একটি স্থায়ী রূপ ও কাঠামো দেয়া, যা ভারতের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনীতে সে দেশের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছে । এখানে কার্যকর সংস্কার ও পরিবর্তন করা হলে স্থানীয় নির্বাচন ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী এবং শান্তিপূর্ণ করে বিষয়টি একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি: 'স্থানীয় সরকার'[1] বিশ্বব্যাপি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন রকম-ফের ও প্রকার ভেদ নির্বিশেষে (পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা, প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ,গণতন্ত্র ইত্যাদি) একটি সর্বজনীন ব্যবস্থা। এটি মূলত রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর একটি উপ-ব্যবস্থা (sub-system)। দেশ ও কালভেদে পার্থক্য থাকলেও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে অস্থানীয়, অনির্বাচিত এবং অর্থ-সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের ক্ষমতা রহিত কোন প্রতিষ্ঠান অর্থ্যাৎ এ তিনটি মৌলিক বিষয়ের স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার ঘাটতি রেখে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ 'স্থানীয় সরকার' হিসাবে পরিগণিত হয় না। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের তৈরিকৃত কোন আইনবলে নিয়োজিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমস্টি দ্বারা পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান 'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ' (Local Authority) হতে পারে, কিন্তু 'স্থানীয় সরকার' (Local Government) নয়। এখানে নির্বাচন একটি অপরিহার্য উপাদান। 'নির্বাচন' এরও আবার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড (Standard) রয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতা'র মানদন্ড অনুসরণ করতে হয়। তাছাড়া নেতৃত্ব ও অর্থ ব্যবস্থার বিষয়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ সনের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত ও পাশ হওয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান যা একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়, সে সংবিধান দ্ব্যর্থহীনভাবে '*প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে'* এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে (অনুচ্ছেদ-১১)। পরে সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদের স্থানীয় শাসন অংশের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে নির্বাচন, শাসন ক্ষমতা এবং অর্থ আহরণ ও ব্যয়ের বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই বলা যায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থাপনার একমাত্র প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনকে পরিস্কারভাবে সে দায়িত্ব অর্পন করা হয়নি। নানা সময়ে সরকারে আসা রাজনৈতিক দলসমূহ জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি ব্যবস্থার পরিবর্তে

[1] সংবিধানে তৃতীয় পরিচ্ছদে বাংলা পাঠে 'স্থানীয় শাসন' এবং ইংরেজী পাঠে 'Local Government' লেখা রয়েছে। সংবিধানের ১৫৩ ধারা অনুযায়ী বাংলা ও ইংরেজী উভয়ই 'নির্ভরযোগ্য' পাঠ। তবে বাংলা পাঠে স্থানীয় শাসন লেখা থাকলেও এ প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রহণে করতে কোথাও কোন আপত্তি ওঠেনি। তাই জনপ্রিয় অভিধা হিসাবে স্থানীয় সরকারকে গ্রহণ করে আলোচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের কোন উদ্যোগ নেয়া হলে স্থানীয় শাসনের স্থলে স্থানীয় সরকার শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপিত হতে পারে।

পরস্পরবিরোধী ও বিচ্ছিন্ন একটি অন্তর্ঘাতমূলক 'দুর্বৃত্ত ডেন' রূপান্তরিত করেছে। তাই স্থানীয় সরকারে অন্তর্ভূক্তিমূলক, শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে

সংবিধান নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়ে আসছে: স্থানীয় সরকার গঠন সংক্রান্ত সাংবিধানিক অঙ্গীকার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সরকারসমূহ ১৯৭৩ থেকে ধারাবাহিকভাবে অবজ্ঞা, অবহেলা ও উদাসীনতাই শুধু দেখায়নি, দলীয়ভাবে স্থানীয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী সকল প্রশাসনিক এককে এক সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যার ফলে দেশে বিভিন্ন স্তরে কতগুলো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু 'সত্যিকারের একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম' হিসাবে গড়ে ওঠেনি।

যেমন ১৯৭৩-১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন প্রশাসনের চারটি এককের মধ্যে শুধুমাত্র একটি এককে স্থানীয় সরকার ছিল। সেটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। পৌরসভা কার্যকর থাকলেও কার্যগতভাবে পৌর এলাকা কোন প্রশাসনিক একক ছিল না। পরে সংবিধান ও আইন বাঁচানোর জন্য পৌর এলাকাকে প্রশাসনিক একক ঘোষণা করা হয়। ১৯৮১-৮২ সনে থানা পর্যায়ের প্রশাসনিক এককে উপজেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও থানা দুইটি এককে স্থানীয় সরকার গঠিত হয়। জেলায় ঐতিহাসিকভাবে জেলা পরিষদের ভৌত অবকাঠামো-একটি ভবন, কিছু কর্মচারি এবং আয়-ব্যয়ের সংস্থান থাকলেও কোন নির্বাচিত পরিষদ ২০১৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ছিল না। বিভাগ (Division) পর্যায়ে জেনারেল আইয়ুব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র পর কোন জনসম্পৃক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়নি। ১৯৮০-৮১ সন পর্যন্ত দেশের সকল জেলায় শুধুমাত্র পৌরসভা ছিল। সর্বমোট পৌর সভার সংখ্যা ছিল ১৯৭৪ পর্যন্ত ৫০টি পরে ২০২৪ পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা ৩২৮ এ উপনীত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে দেশের সমতলের মত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার সাথে ১৯৮৮ পর পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ যুক্ত করা হয়। দেশের সমতল ও পার্বত্য এলাকা মিলে মোট বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫,৪৮০। এসব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত অনির্বাচিত নেতার সংখ্যা প্রায় ৬০-৬২ হাজার। নির্বাচিত বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় রয়েছে সনাতনী (Customary) রাজা-হেডম্যান-কারবারী ব্যবস্থা এবং দেশের সেনানিবাসসমূহে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে 'ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড'।

এ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের চেয়ে পুরোনো: এ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ১৯৭২ এর সংবিধান সৃষ্টি করেনি, গ্রাম ও শহরসমূহে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে নতুন দেশের নতুন সংবিধানের মাধ্যমে আত্তিকরণ করা হয়েছে মাত্র। আত্তিকরণটিও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে চৌকিদারী পঞ্চায়েত (১৮৭০), ইউনিয়ন পঞ্চায়েত (১৮৮৫), ইউনিয়ন কমিটি (১৮৮৭), ইউনিয়ন বোর্ড (১৯১৯), ইউনিয়ন কাউন্সিল (১৯৬০) এর ধারাবাহিকতায় প্রথমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ও পরে ১৯৭৩এ 'ইউনিয়ন পরিষদ' পুনর্গঠিত হয়। নগর স্থানীয় সরকারের শুরু ১৮৬৪ সালে। সে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় পৌরসভাসমূহ নবরূপে ১৯৭২ এর পুনর্গঠিত হয়। বৃটিশ ও পাকিস্তান সময়ে জেলা পরিষদসমূহ একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে জেলা পরিষদ আজ পর্যন্ত সেরূপ শক্তিশালী কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ফিরে পায়নি।

উপজেলা পরিষদে সত্যিকার অর্থ কোন 'পরিষদ' নির্বাচিত হয় না। শুধু তিনজন নির্বাহী নির্বাচিত হন। জেলা পরিষদে সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার নেই । পার্বত্য তিন জেলায় ভোটার তালিকা সংক্রান্ত একটি জটিলতাকে কেন্দ্র করে ১৯৮৯ সনের পর থেকে পার্বত্য জেলা পরিষদ (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে কোন নির্বাচনই হয়নি।

তাই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা হয়েছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের 'নির্বাচন ব্যবস্থা' সংস্কারের উদ্যোগ সফলভাবে করতে হলে বিদ্যমান স্থানীয় সরকারের সাতটি যে পৃথক আইন ও ভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো তা সংস্কার করতে হবে (আইনসমূহের তালিকা পরিশিস্ট-১ এ সংযোজিত)। এ বিষয়ে সংস্কারর প্রস্তাব রচনা এ কমিশনের আওতাধীন না হলেও এ সম্পর্কে একটি পথ রচনা ব্যতিত স্থানীয় সরকারের জন্য সহজ একটি নির্বাচন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা দুঃসাধ্য। একইভাবে নির্বাচন কমিশনকেও পৃথকভাবে প্রতিটি স্তরের পৃথক নির্বাচন তফসিলের কারণে নির্বাচনে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ম্যানুয়েল ও আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হয়। সর্বশেষ ম্যানুয়েল ও বিধিসমূহ পরিশিষ্ট-২ এ দেখা যেতে পারে।

সাংবিধানিক সংস্কার

সুপারিশসমূহ

১. সংবিধানের স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিধানসমূহের পুনঃপর্যালোচনা দরকার এবং এখানে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথমে তিনটি সুপারিশ করা হল।

ক) সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদের সকল "স্থানীয় শাসন" শব্দাবলীর স্থলে "স্থানীয় সরকার" প্রতিস্থাপিত হবে। স্থানীয় সরকার বা Local Government আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শব্দ বা প্রত্যয়। অনুবাদ করতে যেয়ে 'Local Governemnt' কে 'স্থানীয় শাসন' হিসেবে উল্লেখ করায় স্থানীয় সরকারের মূল ধারণা বিকৃত হয়ে পড়েছে।

খ) নির্বাচনসহ সকল ক্ষেত্রে "সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন" এ ধারাটির এ অংশ সংশোধন করে সংবিধানে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য জন্য উপযোগী একটি কার্যশীল সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করে দিতে পারে যা জাতীয় সরকার ও দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। *সে কাঠামো সুরক্ষায় গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করা যেতে পারে। সে কাঠামোটি হতে পারে দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় সরকারের মত রাষ্ট্রপতি সরকারে আদলের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির প্রতিরূপ হতে পারে। বিরাজিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে চেয়ারম্যান ও মেয়র সর্বস্ব এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার মত করেই কাজ করে।*

গ) সংবিধানের ১১৯ (১) অনুচ্ছেদে একটি নতুন লাইন যুক্ত করা যেতে পারে, "নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে স্থানীয় পরিষদের নির্বাচন সমূহ পরিচালনা করিবে।" এটি হলে নির্বাচন কমিশন সরকারের অনুরোধের অপেক্ষা না করে নিজেরা স্বাধীনভাবে স্থানীয় নির্বাচনের সকল তফসিল সময়মত নির্ধারণ করতে সাংবিধানিকভাবে সক্ষম হবে।

২. আইন, সংগঠন ও অন্যান্য কাঠমোগত সংস্কার

ক. ১৯৭২এর পর ৫টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য পাম্পরিক সম্পর্কবিহীন যে ৫টি পৃথক আইন ও অসংখ্য বিধিমালা সময় সময় জারি করা হয়েছে সেসব আইন ও বিধিসমূহ বাতিল করে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ একটি একীভুত ও একক স্থানীয় সরকার আইন ও প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করে সকল পরিষদ সমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এরকম একটি বা দুইটি আইন করা হলে ঐ আইন বলে পাঁচটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো হবে একই ধাচের সংসদীয় পদ্ধতির। তখন নির্বাচন ব্যবস্থাটিও হবে সহজ, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সময় সাশ্রয়ী।

খ. প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত নারী আসনসমূহ আবর্তক বা রেটেশনাল পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সংরক্ষণ করে পূরণ করা যেতে পারে। তাতে সংগঠনে দ্বৈততা পরিত্যক্ত হবে। নারীগণ একটি নিজস্ব আসনে শাসন ও উন্নয়নে অংশ নিতে পারবেন।

গ. গ্রামীণ ও নগরেরর সর্বত্র সকল প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো হবে সমরূপ। স্থানীয় সরকারের জন্য 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' নামে একটি নিজস্ব সার্ভিস কাঠামো থাকবে। সে সার্ভিসের অধীন জনবলের উর্ধ্বমূখী ও নিম্নমূখী পদায়নের সুযোগ থাকবে। কর্মচারিদের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সিটি করপোরেশন পর্যন্ত অভিগম্যতা থাকলে পদোন্নতি ও পদায়নের সুযোগ সৃস্টি হবে।

ঘ. স্থানীয় সরকারের জন্য জাতীয় সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ছাড়াও জাতীয় সরকারের অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ সম্পর্কিত একটি গ্যারান্টি ক্লজ থাকলে স্থানীয় সরকারের আগাম উন্নয়ন পরিকল্পনা করা সহজতর হয়।

ঙ. সংবিধান ও আইন কাঠামো পরিবর্তন হলে দেশের সমতল ও পার্বত্য সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে একটি অভিন্ন ও একক তফসিলে ভিন্ন ভিন্ন দিনে নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে। দেশের ৫টি প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে পাঁচ বছরে মাত্র একবার সর্বাধিক দেড় থেকে দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

চ. পার্বত্য অঞ্চলে ভোটার তালিকার ওপর একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্য একদিনে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে।

ছ. দেশের কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের অনুরূপ স্থানীয় সরকারসমূহ হতে পারে সংসদীয় পদ্ধতির। প্রতিটি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচনে শুধু সদস্য বা কাউন্সিলরগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। সাধারণ নির্বাচনের পর মেয়র বা চেয়ারম্যানসহ সকল নির্বাহীগণের নির্বাচন নিজ নিজ পরিষদের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হবে। এভাবে জাতীয় সংসদের মত দুটি পর্যায়ে নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

জ. একটি একক তফসিলে জাতীয় নির্বাচনের জন্য তৈরিকৃত ভোটার তালিকায় ২০২৫ এ জাতীয় নির্বাচনের আগে এবং পরে সকল সময় সরকারের শেষ সময় অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার পর পর স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঝ. জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে যেহেতু কার্যত কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নেই। এ মুহূর্তে সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন একসাথে করা সম্ভব। এখন নতুন একটি স্বচ্ছ ক্যানভাসে নতুন ছবি আঁকা সম্ভব। নতুবা নতুন নির্বাচনের আগে অনেক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ শেষ করার আইনী প্রশ্ন দেখা দিত।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতি চালু করার আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে জন পরিসরে থাকলেও কোন সুয়োগ সৃষ্টি হয়নি। এখন সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আগামী এপ্রিল ২০২৫ এর মধ্যে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ৫টি প্রতিষ্ঠানের জন্য দুইটি একীভূত স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন করে আগামী জুন ২০২৫ এর মধ্যে সকল সমতল ও পাহাড়ের ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে বিস্তারিত কাজ মার্চ ২০২৫ এর আগে সমাপ্ত করতে পারে।

ঞ. একইভাবে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে সংসদীয় কাঠামোতে সংস্থাপিত করে আইন সংশোধন করে জুন/২০২৫ এর মধ্যে পাহাড়ের দুইটি পরিষদের নির্বাচনও সমাপ্ত হতে পারে।

উপরে উল্লেখিত ক-ছ পর্যন্ত সুপারিশ সমূহের উপর আরও ব্যখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত পৃথক ধারণাপত্র এ অধ্যায়ের পরিশিস্টে দেখা যেতে পারে (পরিশিস্ট-৩)।

কেন ও কীভাবে একক আইন ও তফসিলে স্থানীয় নির্বাচন ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী এবং তূলনামূলকভাবে কম প্রশাসনিক জটিলতামুক্ত হতে পারে সে জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠনসমূহের সর্বশেষ জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন সমূহের সরকারি ব্যয়, জনবল ব্যবহার ও সন্ত্রাসের একটি চিত্র দেখা যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠান	নির্বাচন অনুষ্ঠানের বছর (সংখ্যাসহ)	সরকারি ব্যয় (প্রার্থীর ব্যয় ধরা হয়নি)	নির্বাচনী জনবল নিয়োগ	সন্ত্রাস ও অনিয়ম	মন্তব্য
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন	২০২৪ (৩০০+৫০ আসন)	১৯২৭,৫০,৬৮,১০৭/-	৮,২৪,,৫৯৮	বিরোধী দল না থাকা সত্ত্বেও দলের অভ্যন্তরে ব্যাপক সন্ত্রাস সংগঠিত হয়	এটি ছিল মূলত একদলীয় নির্বাচন
১. ইউনিয়ন পরিষদ (৪৫৭৯)	২০২১ (৪,১৩২)	৬০৪,৪৩,৭২,৯৫৯	৯,৩৭,৯৫৯	বিরোধী দলসমুহ নির্বাচন বর্জন করায় সরকারি দলের প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়।	স্থানীয় নির্বাচনে সাধারণত যে হারে ভোটার অংশগ্রহন থাকার কথা তা ছিল না।
২. উপজেলা পরিষদ (৪৯৫)	২০২৪ (৪৬৯)	১৫৩৯,৮৩,৩৪,৪৩২	৮,৩৭,০৯২	ঐ	ঐ
৩. পৌরসভা (৩৩০)	২০২০ (২৩২)	১১৮,৭৮,২১,০১৬	৮১,৭২৩	ঐ	ঐ
৪. সিটি কর্পোরেশন (১২)	২০২০ (২০২৪)	১০৪,৯৬,৫৩,৮১১	১,০১,৯৩১	ঐ	ঐ
৫. জেলা পরিষদ (সমতল) (৬১)	২০২২ (৬১)	১৭,২৩,৪৯,১৭৯	৩,৩৩৬	এখানে কোন প্রতিদ্বন্দিতা ছিল না।	জনীন ও প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার বিভিত্তিক ব্যবস্থা নয়।
৬. জেলা পরিষদ(পাহাড়)-(৩)	১৯৮৯ সালে প্রথম নিবাচন হয়।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৯৮৯ সালের পর কোন নির্বাচন হয়নি।
৭. আঞ্চলিক পরিষদ (পাহাড়)-১	২৭ মে ১৯৯৯ সালে গঠিত হয়।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিধান থাকলেও কোন নির্বাচন হয়নি।
৮. রাজা -হেডম্যান-কারবারী (তিন জেলা মিলে ৩৭৫ জন হেডম্যান ও ২,৫৩১ কারবারি রয়েছেন।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	ডেপুটি কমিশনার কতৃক নিয়োজিত হন। প্রতিজন মাসে হেডম্যান ১,০০০টাকা এবং কারবারি ৫০০ টাকা ভাতা পান।
৯. ক্যান্ট:বোড	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	সরকার নিয়োজিত
১-৫ ক্রমিকের স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনের মোট ব্যয় ও জনবল	মোট ৫,৪৮৯টি স্থানীয় পরিষদের মধ্যে ৫,০০৬টিতে নির্বাচন হয়	২৩৮৫,২৫,২৯,৩৯৭	১৯,৬২,০৪১		

উৎস: নির্বাচন কমিশন অক্টোবর, ২০২৪

বি দ্র: শেষের ৮ ও ৯ ক্রমিকে নির্বাচনের বিধান নেই। ৮কে প্রথাগত (Customary) এবং ৯কে প্রশাসনিক ‘সেবা সংস্থা’ হিসাবে দেখা হয়।

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে কোন গুণ-মান ও সাধারণ অংশগ্রহণ বিবেচনায় কোন নির্বাচনই নয়। উন্নত নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি বিচারের প্রশ্ন অবান্তর। এরকম প্রহসনের নির্বাচনে ২০২৪ এ ১৯২৭,৫০,৬৮,১০৭ (প্রায় ২০০০) কোটি টাকা দৃশ্যমান বা আনুষ্ঠানিক ব্যয় হয় এবং ৮,২৪,৫৯৮ জনবল কাজ করেছে। বিপরীতক্রমে পাঁচটি স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ২,৩৮৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১৯ লাখ ৬২ হাজার লোকবল নিয়োজিত ছিল। অনায়াসে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের ব্যয় ৬০০ কেটি টাকায় নামিয়ে এনে ১৯ লাখের বদলে ৯ লাখ জনবল নিয়োগ করে স্থানীয় নির্বাচন নির্বাহ করা যায়।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়কাল পাঁচটি নির্বাচনের তফসিল বিবেচনায় ২২৫ দিন থেকে ৪৫ দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব। ৩৬৫ দিনের একটি বছরে বাংলাদেশে ২২৫ দিন শুধু নির্থকভাবে নির্বাচনে ব্যয় করা হয়।

নির্বাচন কমিশনকে বিভিন্ন সময়ের স্থানীয় নির্বাচনের জন্য ১৫ থেকে ২১টি বিধি ও আচরণবিধিমালা তৈরি করতে হয়। এখানে যথাযথ সংস্কার হলে এক বা দুইটি বিধিমালার মাধ্যমে সকল স্থানীয় নির্বাচন সম্পন্ন হতে পারে। সরকারি কারিকর্তা ও সরকারের অনেক সময় সাশ্রয় হতে পারে (পরিশিষ্ট-২)।

পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখিত পাঁচটি পৃথক দুইটি আইনে সমন্বিত হতে পারে। একটি আইনে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের তিনটি প্রতিষ্ঠান, দ্বিতীয় একটি আইনে নগর স্থানীয় সরকারের দুইটি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজ কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। পরিশিষ্ট-২ এর আইনসমূহ বড়জোর দুটি বিধিতে সমন্বিত হতে পারে।

পাঁচটি প্রতিষ্ঠান, তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করর্পোরেশন এ পাঁচটি নির্বাচন একটি অভিন্ন তফসিলে করার সূত্রটি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের একজন ভোটার একই সাথে ভোটের দিন তিনটি ব্যালটে তিনটি ভোট দিবেন। ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ের একজন ভোটার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যকে একটি ভোট, উপজেলা পরিষদের সদস্যকে একটি ভোট এবং জেলা পরিষদ সদস্যকে একটি ভোট প্রদান করবেন। পৌরসভার একজন ভোটার একইভাবে নিজের কাউন্সিলরকে, উপজেলা পরিষদের সদস্যকে এবং জেলা পরিষদ সদস্যকে মোট তিনটি ভোট দিবেন। সিটি কর্পোরেশনের ভোটারগণ দুটি ভোট দেবেন। একটি নিজের ওয়ার্ড সদস্যকে অপর ভোটটি জেলা পরিষদের ওয়ার্ড মেম্বারকে দিবেন। একই দিনে একটি এলাকায় সকল পরিষদ ও কাউন্সিলে একই তফসিলে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। নিম্নের চিত্রে ভোট পর্বটি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

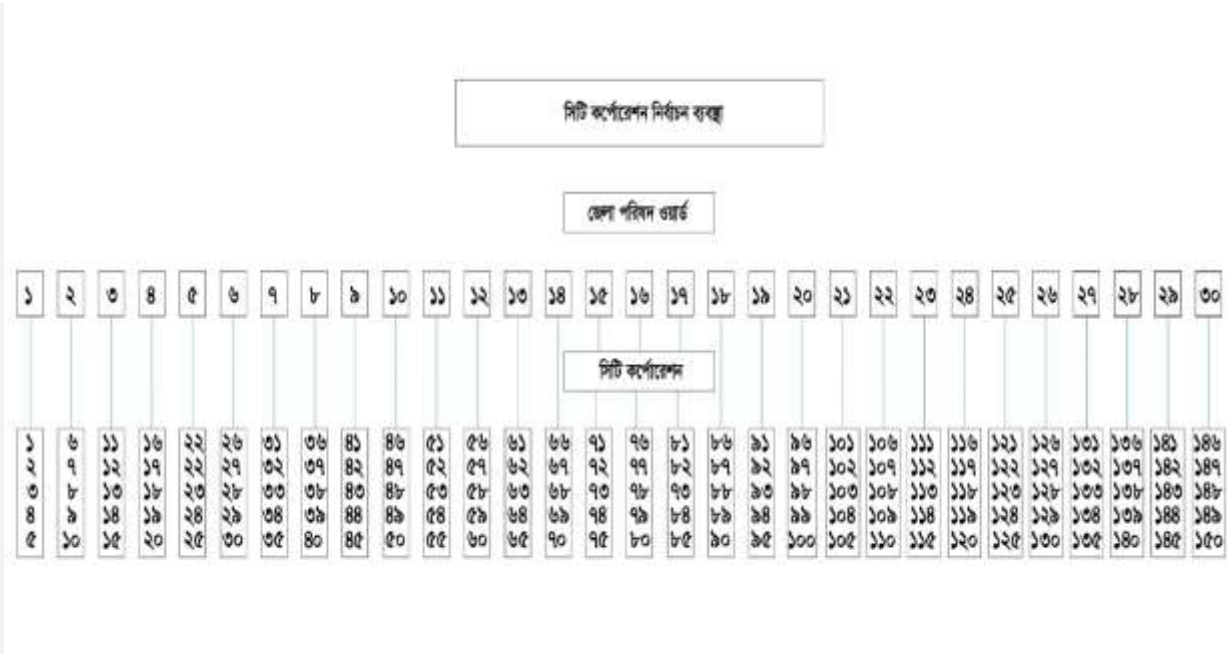

পরিশিষ্ট -১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনসমূহ

১. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন)আইন ২০১০, ৬০ নং আইন

২. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন ২০১৫, ৮ নং আইন।

৩. উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮

৪. জেলা পরিষদ আইন ২০০০ (২০০০এর ২২ নং আইন)

৫. জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৪ নং আইন)

৬. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১৫ (২০১৫ সনের ২৪ নং আইন)

৭. স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯

৮ . পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন **১৯৮৮**

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন **১৯৯৯**

পরিশিষ্ট-২: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনের বিদ্যমান বিধি-বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

সিটি কর্পোরেশন:

(১) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

(২) সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬

(৩) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৬

উপজেলা পরিষদ:

(১) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩

(২) উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬

(৩) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯

পৌরসভা:

(১) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

(২) পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৫

(৩) পৌরসভা নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯

ইউনিয়ন পরিষদ :

(১) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০

(২) ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬

(৩) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৯

জেলা পরিষদ:

(১) জেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৬

(২) জেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬

পরিশিষ্ট-৩: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার - সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন একটি একক তফসিলে অন্তর্ভুক্তি:

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন নানা কারণে জটিল, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বর্তমান স্থানীয় সরকার কাঠামো গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা চর্চার পুরোপুরি অনুকূল না হওয়ায় একদিকে যোগ্য নেতৃত্ব বিকাশে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারছে না, অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা চর্চায় থাকছে না যুগোপযোগী ভারসাম্য। প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে পড়ছে এক ব্যক্তি তথা চেয়ারম্যান বা মেয়র সর্বস্ব এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর একদিকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশাসনিক খবরদারি, অপরদিকে ওপরের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ দিন দিন বাড়ছে। মেয়র ও চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়ে পড়েছে অতিমাত্রায় ব্যয়বহুল। সদস্য ও কাউন্সিলর নির্বাচন হয়ে পড়ছে সম্পূর্ণভাবে গুরুত্বহীন। তাই আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাঠামোকে সংস্কার করে নির্বাচন পদ্ধতির সহজীকরণ এবং সাংগঠনিক কাঠামোকে ভারসাম্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। বিষয়টি নীতি নির্ধারকদের গভীর মনযোগের দাবি রাখে।

আমাদের জাতীয় ও স্থানীয় সরকার উভয়ের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। জাতীয় সরকারের নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর পর একবারই হয়, কিন্তু একটি জাতীয় সরকারের মেয়াদের পাঁচ বছর ধরেই নানা স্তরের স্থানীয় সরকারের অসংখ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। নির্বাচনকাল সকল দেশেই এবং সর্বসময়ের জন্যই একটি অস্থিরতার সময়। অস্থিরতা সমাজের ও রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কাজে কম-বেশি বিঘ্ন সৃষ্টি করেই থাকে। স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান তথা ইউনিয়ন পরিষদ,

উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন একটি একক তফসিলে সর্বাধিক একমাস বা পঁয়তাল্লিশ দিন সময় নিয়ে শেষ করা যায়। এ নির্বাচন হবে ব্যক্তি তথা প্রার্থী, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের জন্য ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী। এ নতুন নির্বাচন পদ্ধতি স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক ও স্থানীয় জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে বলে কমিশন বিশ্বাস করে।

বর্তমান ব্যবস্থায় পাঁচটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পৃথক পাঁচটি তফসিলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি তফসিলে ৪৫ দিন করে একটি পাঁচ বছরের সরকারের সর্বমোট ২শত ২৫ দিন সময় ব্যয় হয়। এতে বিপুল আর্থিক এবং প্রশাসনিক ঝক্কি-ঝামেলারও অতিক্রম করতে হয়। সরকারের সমন্বিত ও পরিকল্পিত উন্নয়ন কাজেও প্রচুর বিঘ্ন ও অপচয় ঘটে। এ পাঁচটি প্রতিষ্ঠান এক একটি জেলার ভৌগোলিক কাঠামোতে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে কাজ করে থাকে। বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচন যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়, তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মেয়াদকালে তাদের কার্যকাল শুরু ও শেষ হয়। এ কারণে একটি বিশেষ এলাকায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় বাজেটের সাথে তাল রাখা যায় না। তাছাড়া আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রেও সময়কালের একটি অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এক সাথে সকল নির্বাচন সম্পন্ন করা গেলে এ দুটি ক্ষেত্রেও একটি শৃঙ্খলা আনয়ন সহজ হতে পারে।

জেলা পরিষদ ছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক ভোটার তিনটি করে ভোট দিয়ে থাকেন। পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের বেলায় প্রতিজন নাগরিক মেয়র বা চেয়ারমানকে একটি, সাধারণ সদস্য বা কাউন্সিলরকে একটি এবং সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য বা কাউন্সিলরকে একটি করে ভোট দিয়ে থাকেন। গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ভোটার এবং সিটি কর্পোরেশন বাদে সকল পৌর এলাকার ভোটারগণ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের দুই ভাইস-চেয়ারম্যানকে মোট তিনটি ভোট দিয়ে থাকেন। জেলা পরিষদে সাধারণ নাগরিকগণের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না বা সাধারণের ভোটাধিকার নেই। জেলা পরিষদও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত। নতুন প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তা অতি সহজে করা সম্ভব।

ভোটে শৃঙ্খলা বিধান বা সহজীকরণের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো এবং আইন কাঠামোর সামঞ্জস্যতা বিধান প্রয়োজন। বর্তমানে জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক এলাকা নির্বিশেষে প্রতি জেলায় জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ঐ জেলার উপজেলার সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কারণ প্রতি উপজেলা থেকে একজন সদস্য এবং মোট সদস্যের একতৃতীয়াংশ নারী এবং জেলার অধীন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যন ও পৌরসভার মেয়রগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হন। ২০২২ সনে ‘জেলা পরিষদ আইন ২০০০’ সংশোধন করে পরিষদের সদস্য কাঠামোতে পরিবর্তনটি করা হয়। এ পরিবর্তন জেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোর মূল অসামঞ্জস্যতা নিরসন করেনি। জেলা পরিষদে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। বর্তমান আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যানসহ তিনজন এবং ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানসহ ১৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জেলায় সাধারণ ভোটারদের ভোটাধিকার নাই। উপজেলা পরিষদের ওয়ার্ডভিত্তিক সদস্য নির্বাচন নেই। শ্রেণি ও আকার অনুযায়ী পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে কাউন্সিলর সংখ্যা কম-বেশি হওয়া যুক্তিসঙ্গত। অন্য তিনটি গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও আয়তন বিবেচনায় সদস্য পদে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। পদের ধরণ ও নির্বাচন পদ্ধতিও এক ও অভিন্ন নয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (এসডিজি) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ডেল্টা প্ল্যান প্রভৃতির আলোকে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে উত্তরণের উপযোগী কাঠামো বিনির্মাণের স্বার্থে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনর্বিন্যাস করে ব্যাপক আধুনিকায়ন প্রয়োজন। এই পুনর্বিন্যাসের জন্য মোটা দাগে নিম্নের ৬টি বিষয় মনোযোগ দাবি করে।

১. স্থানীয় সরকারে গ্রাম ও নগরের বিভক্তি ও স্তর সংখ্যা হ্রাস: প্রশাসনিক, আর্থিক এবং স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকারের সঠিক সমন্বয় ও সংহত করার জন্য বহুস্তরীয় স্থানীয় সরকারের স্তর ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা হ্রাস বা সুষমকরণের বিষয়টি এখন ভাবার সময় এসেছে। সময় এসেছে গ্রামীণ ও নগর স্থানীয় সরকারের বিভক্তি এখন আর প্রযোজ্য হবে কি-না তা ভাবার। এক সময় সারা বাংলাদেশটাই ছিল একটি গ্রাম। এখন বাংলাদেশের শহর-গ্রামের জীবন-জীবিকা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনেক কাছাকাছি। তেমনি জীবন সংগ্রাম, চাহিদা এবং জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও অনেকটা কাছাকাছি। দেশে পঞ্চাশ বা ষাট বছর আগের যে গ্রাম ও তার ভৌগোলিক প্রান্তিকতা (remoteness), তা আর সে অবস্থা ও অবস্থানে নেই। গ্রামের মানুষ এখন গ্রামে থেকেও শহুরে ধাচের জীবনযাপন করে। ভৌত অবকাঠামো যথা সড়ক-সেতু, ভারচুয়াল যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, যানবাহন, শিক্ষা, অকৃষি পেশার ক্রম সম্প্রসারণ গ্রামীণ জীবনে ব্যাপক পরিববর্তন নিয়ে এসেছে। তাই বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থার প্রশাসনিক কাঠামোতেও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সরকার গ্রাম-শহর বিভক্ত করে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে দিয়েছে সে ব্যবস্থাকে শত শত বছর অবিকল লালন করতে হবে তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তাই এখন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নগর এবং গ্রামের বিভক্তি বিলুপ্তির সময় এসেছে। প্রয়োজন একীভূত একটি একক কাঠামো। তাতে স্তরের সংখ্যাও কমবে, কমবে সংঘাত এবং হ্রাস পাবে সরকারের অনুৎপাদনশীল ব্যয়।

২. সমন্বিত আইন: গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন এবং নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন করা প্রয়োজন। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি পৃথক আইন এবং পাঁচটি ভিন্ন ও পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো এবং তিনটি ভিন্ন পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা রয়েছে। আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের স্বচ্ছ কোনো রূপরেখা নেই। নেই আন্তঃপ্রতিষ্ঠান কর্ম-সম্পর্ক। সমন্বিত কোনো কর্মচারি কাঠামো নেই। রাজস্ব সংগ্রহেও পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা অনুপস্থিত। এ কারণে সকল স্থানীয় সরকারে প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচটি পৃথক আইনের পরিবর্তে দুটি পৃথক সমন্বিত আইন কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক ল' (framework law or mother law) প্রণয়ন করা যেমন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে সমন্বিত 'পঞ্চায়েত রাজ অ্যাক্ট'। ভারতে একটি একক আইনের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা মন্ডল পঞ্চায়েত (ব্লক পর্যায়) ও জেলা পরিষদ গঠিত হয়, একটি অভিন্ন তফসিলে তিন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ও সহযোগিতা নিশ্চিত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে এক 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৬০' দ্বারা ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল ও মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠিত ও পরিচালিত হতো। একটি আইন কাঠামোতে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হলে প্রশাসনিক সুবিধা অনেক বেশি। একই আইনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্ম বিভাজন থাকবে আবার সমন্বয়েরও বিধান থাকবে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কার্যকর আইনের সংখ্যা শতাধিক। এসকল আইন অনুযায়ী বর্তমানে পরিষদসমূহ পরিচালনা করা যায় না। বেশিরভাগ বিধিবিধানগুলো একটি অপরটির হুবহু নকল, কোনো ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক। একারণে প্রতিনিয়ত পরিপত্র (সার্কুলার) জারি করে স্থানীয় সরকার চালাতে হয়। ফলে শতাধিক আইন ও পরিপত্রের পরিবর্তে এ প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনায় দুটি কার্যকর ও যুগোপযোগী আইন কাঠামো প্রতিস্থাপন প্রয়োজন।

৩. রাষ্ট্রপতি আদলের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির স্থানীয় সরকার কাঠামো: জাতীয় সরকারের আদলে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংসদীয় পদ্ধতিতে পুনর্গঠন প্রয়োজন। তাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে অনেকগুলো সুফল পাবে। ক. পুরো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সদস্য বা কাউন্সিলরদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। খ. মেয়র ও চেয়ারম্যান পদ প্রত্যাশীরা সবাই প্রথমে কাউন্সিলর এবং সদস্য হবেন। ফলে কাউন্সিলর এবং সদস্য পদের নেতৃত্বের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। পরিষদের সাধারণ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটিসমূহ কার্যকর অবদান রাখতে পারবে। গ. চেয়ারম্যান বা মেয়রগণ সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন এবং জাতীয় সরকার বা অন্য সরকারি কর্মকর্তা নয়, পরিষদের

কাছে জবাবদিহি করবেন। ঘ. জাতীয় নির্বাচনে ব্যবহৃত দলীয় প্রতীক ব্যবহার না করে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ হতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডে সদস্য ও কাউন্সিলরগণ কোনো দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করবেন না। নির্বাচনের পর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারসমূহের নির্বাহী প্রধানগণ নির্বাচিত হবেন। ঙ. নির্বাহী নির্বাচনে সকল সদস্য স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। চ. সিটি অথবা সকল পরিষদের সকল সাধারণ অধিবেশনে মেয়র বা চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন না। কাউন্সিল বা পরিষদ নির্বাচনের পর পর প্রথম অধিবেশনে সকল সদস্য বা কাউন্সিলরগণ একজন 'সভাধ্যক্ষ' বা 'সভাধিপতি' নির্বাচন করবেন। সভাধ্যক্ষ বা সভাধিপতির ভূমিকা হবে জাতীয় সংসদের স্পিকারের মতো। তিনি চেয়ারম্যান বা মেয়রের সাথে পরামর্শক্রমে বা ৪০ শতাংশ সদস্যদের অনুরোধে অথবা স্ব-বিবেচনায় পরিষদ বা কাউন্সিলের অধিবেশন আহবান করবেন। ছ. এক একটি অধিবেশন এক নাগাড়ে দুই দিনের অধিক স্থায়ী হবে না। আলোচ্যসূচির উপর ভিত্তি করে সভাপতি অধিবেশনের সময়সীমা নির্ধারণ করবেন। জ. পরিষদ বা কাউন্সিলই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং মেয়র বা চেয়ারম্যান কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সহায়তায় প্রধান নির্বাহী হিসেবে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন। ঝ. মেয়র বা চেয়ারম্যান তার পছন্দনীয় কাউন্সিলর বা সদস্যদের মধ্য হতে জাতীয় সরকারের মন্ত্রী পরিষদের অনুরূপ তিন, পাঁচ বা অনধিক সাত জনের একটি নির্বাহী কমিটি করতে পারবেন। তারা পরিষদের পূর্ণকালীন অফিস হোল্ডার হিসেবে গণ্য হবেন এবং তারা পরিষদ বা কাউন্সিলের বিভিন্ন দপ্তরের পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করবেন। সে হিসেবে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবেন। ঞ. কাউন্সিল বা পরিষদে একটি স্বীকৃত বিরোধী পক্ষ, বিরোধী পক্ষীয় নেতা ও 'ছায়া নির্বাহী সভা' (shadow executive council) থাকবে। ট. বিরোধী নেতা ও সভাধিপতি বা সভাপতির পদমর্যাদা হবে মেয়র বা চেয়ারম্যানের এক ধাপ নিচে। ঠ. একটি পরিষদ বা কাউন্সিলের পদমর্যদাক্রম হবে নিম্নরূপ: মেয়র বা চেয়ারম্যান, সভাপতি বা সভাধিপতি, পরিষদের বিরোধী পক্ষীয় নেতা, স্থায়ী কমিটির চেয়ার এবং সাধারণ সদস্য ও কাউন্সিলর এবং, মেয়র, চেয়ারম্যান, সভাধ্যক্ষ, ছায়া পরিষদ নেতা ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে বেতন-ভাতা পাবেন। অন্য সকল সাধারণ সদস্যগণ সার্বক্ষণিক অফিস করবেন না, তাই তারা সভায় অংশগ্রহণের জন্য শুধু সম্মানী পাবার অধিকারী হবেন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও খন্ডকালীন কোনো ব্যবস্থা নেই। কেউ কাজ করুন না করুন, সভায় যোগদান করুন আর নাই করুন, সবাই সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে ভাতা পান।

৪. নারীর আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি প্রবর্তন: নতুন ব্যবস্থায় নারীর সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় পুনর্গঠিত হতে পারে। বিষয়টি কিছুটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মতো, তবে আমাদের সিডিউলড কাস্ট ও সিডিউলড ট্রাইব না থাকায় বাংলাদেশে নারীর আসন সংরক্ষণটা আরও সহজ হবে। প্রথমত প্রতিটি কাউন্সিলে বা পরিষদের মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হবে। এ সংরক্ষণ সাধারণ আসনের অতিরিক্ত আসন হিসেবে নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি ওয়ার্ড সংরক্ষণ। এ আইন কার্যকরের পর প্রথম নির্বাচনে যে সব ওয়ার্ড সংরক্ষিত হবে, সে সব ওয়ার্ডে কোনো পুরুষ প্রার্থী নির্বাচন করবেন না। শুধুমাত্র নারীরাই ঐ আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। দ্বিতীয় নির্বাচনে সেগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং উন্মুক্ত ওয়ার্ডে নারী-পুরুষ সবাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। দ্বিতীয় নির্বাচনে পুনরায় একতৃতীয়াংশের আর এক গুচ্ছ নতুন ওয়ার্ড সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত হবে। একই রীতিতে শুধুমাত্র ঐ এলাকার নারীগণ সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তৃতীয় নির্বাচনে পুরো পরিষদ এলাকার সংরক্ষিত ওয়ার্ডের আবর্তন বা রোটেশন শেষ হবে। একটি ওয়ার্ডের একজন নারী প্রতি তিনটি নির্বাচনের একটিতেই শুধু সংরক্ষিত আসনের সুবিধা পাবেন। বাকি দুটি মেয়াদে সবার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। আদিবাসী ও নানা নৃতাত্তিক জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ঐসব সম্প্রদায়ের নারীদের এ সংরক্ষিত নারী আসনের বিশেষ সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এ ব্যবস্থায় সারা পরিষদ এলাকার নারীগণ পর্যায়ক্রমে এ সুযোগ নিতে পারবেন। পুরুষ ও নারীর একই ওয়ার্ডের যে সংঘাত এতদিন বিদ্যমান ছিল,

তা আর থাকবে না। একতৃতীয়াংশ নারী সদস্য ৫ বছরের পুরো মেয়াদে একটি ওয়ার্ডে কাজ করার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া উপযুক্ত নারীগণ চেয়ারম্যান বা মেয়র, সভাধিপতি বিরোধী দলের নেতা ইত্যাদি পদে নির্বাচিত হবারও সুযোগ পেতে পারবেন।

৫. একক তফসিলে সকল প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন: যদি সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয় তাহলে নির্বাচন ব্যবস্থা ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী এবং সহজতর হয়ে পড়বে। প্রথমত, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ এ দুটি পরিষদকে ওয়ার্ড ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে। প্রতিটি উপজেলার অধীন ইউনিয়ন সমূহের প্রতিটিকে তিনটি উপজেলা ওয়ার্ডে বিভক্ত করা যায়। এভাবে একটি উপজেলায় সর্বোচ্চ ৪৫ এবং সর্বনিম্ন ৩০টি ওয়ার্ড হতে পারে। একই রকমভাবে একটি জেলায় যত উপজেলা প্রতিটি উপজেলাকে তিন ওয়ার্ডে ভাগ করা যায়। প্রতি তিন ওয়ার্ডের একটি ওয়ার্ড নারীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং আবর্তক পদ্ধতিতে তার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইউনিয়ন ও পৌরসভায় বর্তমান ওয়ার্ড সংখ্যাকে জনসংখ্যা ও ভোটার সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা দরকার। ইউনিয়ন পরিষদে প্রতি ৩০০ থেকে ৩৫০ ভোটার বা ১,০০০ জনসংখ্যা পিছু একটি ওয়ার্ড করা যেতে পারে। কোনো ইউনিয়নকে জনসংখ্যার কারণে দ্বিখন্ডিত করার প্রয়োজন নেই। জনসংখ্যা বেশি হলে ওয়ার্ড বাড়বে। একইভাবে পৌরসভা ও সিটি করর্পোরেশন ওয়ার্ডও ভোটার সংখ্যা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে পুনঃনির্ধারন প্রয়োজন।

নির্বাচন যখন একটি একক তফসিলে হবে তখন প্রতিটি ইউনিয়নের ভোটার ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করে তিনটি ব্যালট পাবেন। একটি ব্যালট জেলা পরিষদ সদস্যের, একটি ব্যালট উপজেলা পরিষদ সদস্যের এবং একটি ব্যালট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের। প্রতিজন ভোটার তিনটি পরিষদের তিনটি ওয়ার্ডের ভোটার। এক সাথে একদিনে তিনটি পরিষদের নির্বাচন শেষ হবে। পৌরসভার একজন ভোটার একই প্রক্রিয়ায় তিনটি ভোট দিয়ে দিবেন। সিটি কর্পোরেশনের ভোটারগণ শুধু দুটি ভোট দেবেন। একটি ভোট সিটি কর্পোরেশনের তার নিজের ওয়ার্ড সদস্যকে এবং অপর ভোটটি জেলা পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যকে। এভাবে নির্বাচনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোট হবে নিজ নিজ কাউন্সিল বা পরিষদের অভ্যন্তরে। সাধারণ নির্বাচনের সর্বোচ্চ ১০ দিনের মধ্যে প্রতিটি পরিষদ বা কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন হবে। সে অধিবেশনে সভাধিপতি, মেয়র ও চেয়ারম্যান এবং ছায়া পরিষদ নেতা নির্বাচিত হবেন। নির্বাচনের পর মেয়র এবং চেয়ারম্যানগণ আইন নির্দেশিত পন্থায় 'নির্বাহী কমিটি'র সদস্য নিয়োগ করে দপ্তর বণ্টন করবেন। পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত হবে।

৬. গ্রামীণ পৌরসভাগুলোর বিলুপ্তি: জেলা পর্যায়ের পৌরসভাগুলো বাদে বাকি উপজেলা ও গ্রামীণ বাজারকেন্দ্রিক পৌরসভাগুলো বিলুপ্ত করে ঐ পৌর কার্যক্রমগুলো উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে বণ্টন করে প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা সংহত করা যায়। সর্বোচ্চ ২ বর্গমাইল এলাকা যেখানে উপজেলা ও ইউনিয়ন বিদ্যমান সেখানে পৌরসভা হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিছু পৌরসভা গঠন করা হয়েছে। সে পৌর সভাসমূহ সেবা প্রদান এবং রাজস্ব আহরণের দিক থেকেও সম্পূর্ণ অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এজাতীয় পৌরসভাসমূহ সরকারের রাজস্বের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। তাই প্রযোজ্যক্ষেত্রে বি-পৌরকরণ (de-municipalization) সমীচীন হবে।

গণতন্ত্রের অঙ্গীকারে স্বাধীন হওয়া এদেশের মানুষ সবসময়ই গণতন্ত্রের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের একটি মহত্তম প্রয়াস নির্বাচন। তাই এদেশের মানুষ গণতন্ত্রের ভবিষ্যত নিয়ে ভীষণ আশাবাদী। বর্তমানকালের রাজনৈতিক সংকট শুরু নির্বাচনকে ঘিরে। গণতন্ত্রের পথে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে নির্বাচনসমূহ সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। জুলাই-আগস্টে ২০২৪-এর বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে অবশ্যই সে বাঁধাসমূহ অপসারণের সুযোগ এসেছে। আমরা গণতন্ত্র চর্চার সোনালি দিনে ফিরে যেতে পারব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধশত বর্ষপূর্তির পর জরাজীর্ণ, পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিহীন ও প্রায় অকার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ও ব্যাপক অব্যবস্থাপনা, সন্ত্রাস ও ব্যয়বহুল স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থার ব্যাপক ও মৌলিক সংস্কার আশা করি।

(সংস্কার সংলাপ: সুচনা সূত্র শীর্ষক বই থেকে সংগৃহীত)

[অন্যান্য অধ্যায়গুলো পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকবে]

অধ্যায়-১৫

স্থানীয় সরকার সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫
ফলাফলের সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে সারা বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় পল্লী ও শহর এলাকায় ৪৬,০৮০ টি খানায় স্থানীয় সরকারের সংস্কারের বিভিন্ন বিষয় মতামত গ্রহণের জন্য একটি খানা জরিপ পরিচালনা করে। খানাসমূহের মধ্যে ৮৫.৯ শতাংশ পল্লী ও বাকি ১৪.১ শতাংশ শহরে এলাকায় অবস্থিত। দুই ধাপবিশিষ্ট স্ট্র্যাটিফায়েড ক্লাস্টার দৈব নমুনায়নের মাধ্যমে খানাগুলো নির্বাচন করা হয়। প্রতি খানায় সাধারণত খানা প্রধান অথবা তার অনুপস্থিতে ১৮ বা তদুর্ধ্ব বয়সের একজন খানা সদস্যকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৮.৫ শতাংশ পুরুষ ও ৫১.৫ শতাংশ নারী। পল্লী এলাকায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৮.৩ শতাংশ পুরুষ ও ৫১.৭ শতাংশ নারী, আর শহর এলাকায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৯.১ শতাংশ পুরুষ ও ৫০.৯ শতাংশ নারী।

জরিপের ফলাফলগুলো সংক্ষেপে নিচে উপস্থাপন করা হল:

দলীয় প্রতীকে নির্বাচন: খানা পর্যায়ের উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭১.১ শতাংশ) দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সমর্থন করেন না। মাত্র ২৪.৮ শতাংশ দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সমর্থন করেন।

সারণি ১: দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সমর্থন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	২৪.৯	৭০.৯	৩.৮	০.৪	১০০.০
শহর	২৪.৬	৭১.৩	৩.৪	০.৭	১০০.০
মোট	২৪.৮	৭১.১	৩.৬	০.৫	১০০.০

নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি: উত্তরদাতাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (৫৩ শতাংশ) চান নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে বর্তমান সংরক্ষিত পদ্ধতির পরিবর্তে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি[২] প্রবর্তন করা দরকার। ৩৬.৮ শতাংশ উত্তরদাতা এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা দরকার নেই বলে মনে করেন।

সারণি ২: নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৫১.৪	৩৭.৬	১০.৩	০.৬	১০০.০
শহর	৫৬.১	৩৫.০	৮.০	০.৯	১০০.০
মোট	৫৩.০	৩৬.৮	৯.৬	০.৭	১০০.০

স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন: নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন ৮৩.৭ শতাংশ উত্তরদাতা। মাত্র ৬.৯ শতাংশ উত্তরদাতা এ কমিশন গঠনের প্রয়োজন নেই বলে মত দিয়েছেন।

সারণি ৩: নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট

[২] ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির উদাহরণ: একটি ইউনিয়নে ৯ টি ওয়ার্ড থাকলে প্রথমবার ১, ৪ ও ৭ নং ওয়ার্ডে, দ্বিতীয়বার ২, ৫, ও ৮ নং ওয়ার্ডে তৃতীয়বার ৩, ৬, ও ৯ নং ওয়ার্ডে শুধুমাত্র নারীরা নির্বাচিত হবেন। এভাবে নারীদের জন্য ওয়ার্ড বদল হতে থাকবে।

পল্লী	৮৩.৪	৬.৩	৯.৭	০.৬	১০০.০
শহর	৮৪.৩	৮.০	৭.১	০.৬	১০০.০
মোট	৮৩.৭	৬.৯	৮.৯	০.৬	১০০.০

জনপ্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রায় সকল উত্তরদাতা (৯৭.১ শতাংশ) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন। যারা মনে করেন যে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। তাদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ প্রায় উত্তরদাতা মনে করেন যে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হওয়া উচিত এইচএসসি বা সমমান। আর ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন প্রার্থীদের শিক্ষা এইচএস এসএসসি বা সমমান হওয়া উচিত। প্রার্থীদের স্নাতক বা সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতা চান ২৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা।

সারণি ৪: নির্বাচনে প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ) *

এলাকা	৫ম শ্রেণি/ সমমান	৮ম শ্রেণি/ সমমান	এসএসসি/ সমমান	এইচএসসি/ সমমান	স্নাতক/ সমমান	স্নাতকোত্তর/ সমমান	মোট
পল্লী	০.৭	২.৫	৩৩.৬	৩৭.৯	২২.০	৩.৩	১০০.০
শহর	০.৭	১.৬	২২.৮	৩৭.৫	৩২.৩	৫.২	১০০.০
মোট	০.৭	২.২	৩০.০	৩৭.৮	২৫.৪	৩.৯	১০০.০

* যারা মনে করেন যে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তাদের মধ্যে।

অভিন্ন আইন প্রণয়ন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পাঁচটি মৌলিক আইন ও শতাধিক প্রজ্ঞাপন/আদেশ রয়েছে যা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনাকে জটিল করে তুলেছে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম পরিচালনাকে সহজ ও সবার কাছে বোধগম্য করতে সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এক ও অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা উচিত বলে মত দিয়েছেন তিন-চতুর্থাংশের বেশি (৭৭ শতাংশ) উত্তরদাতা। মাত্র ৯.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বর্তমানের আইনসমূহের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা উচিত বলে মনে করেন।

সারণি ৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৭৫.৬	১০.১	১৩.৪	০.৯	১০০.০
শহর	৭৯.৯	৮.১	১১.১	০.৯	১০০.০
মোট	৭৭.০	৯.৪	১২.৭	০.৯	১০০.০

স্থানীয় সরকার সার্ভিস: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন প্রশাসনিক/দায়িত্বশীল পদে নিজস্ব জনবলের সংকট রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়। জনবলের নির্দিষ্ট কাঠামো, পদোন্নতি ও পদসোপান নেই। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত সার্ভিস কাঠামো (স্থানীয় সরকার সার্ভিস) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিন-চতুর্থাংশের বেশি (৭৭.৫ শতাংশ) উত্তরদাতা। মাত্র ৮.৭ শতাংশ উত্তরদাতা নতুন সার্ভিস কাঠামো প্রয়োজন নেই বলে মত দিয়েছেন।

সারণি ৬: স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৬৩.২	২৭.৮	৮.৩	০.৭	১০০.০
শহর	৬৭.২	২৬.৬	৫.৫	০.৮	১০০.০
মোট	৬৪.৫	২৭.৪	৭.৪	০.৭	১০০.০

উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনা: বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান নগরায়নের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা সদর ও অনেক ইউনিয়ন সদরে অপরিকল্পিত বাণিজ্যিক, শিল্প ও আধুনিক বাসস্থান গড়ে উঠছে, যা পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি তৈরি করছে। এটি মোকাবিলায় ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন। মাত্র ৭.৭ শতাংশ উত্তরদাতা নগর পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকা প্রয়োজন নেই বলে মত ব্যক্ত করেন।

সারণি ৭: উপজেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনাবিদের কার্যালয় থাকার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৮০.৫	১০.৫	৮.৪	০.৬	১০০.০
শহর	৮৫.০	৭.৭	৬.৬	০.৭	১০০.০
মোট	৮২.০	৯.৬	৭.৮	০.৭	১০০.০

নির্বাচনে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ: স্থানীয় সরকারের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য যেহেতু বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি জন দাবি রয়েছে, কিন্তু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় তা কতটুকু সম্ভব সে বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়ায়, স্থানীয় নির্বাচনে সদস্য বা কাউন্সিলর হিসাবে সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজীবি-পেশাজীবিদেরও নির্বাচনে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়ার প্রশ্নে অর্ধেকের বেশি (৫৮.২ শতাংশ) উত্তরদাতা স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে সদস্য ও কাউন্সিলর হিসাবে চাকুরিজীবী-পেশাজীবীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন। আর ৩৭.৭ শতাংশ উত্তরদাতা এ সুযোগ থাকা উচিত নয় বলে মনে করেন।

সারণি ৮: স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৫৬.১	৩৯.৬	৩.৮	০.৫	১০০.০
শহর	৬২.৬	৩৩.৮	২.৯	০.৬	১০০.০
মোট	৫৮.২	৩৭.৭	৩.৫	০.৫	১০০.০

দায়িত্ব পালনে খন্ডকালীন ও সার্বক্ষণিকতার প্রশ্ন : উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭২.১ শতাংশ মনে করেন যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি পূর্ণকালীন হওয়া উচিত। অর্থাৎ যারা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন, পূর্ণকালীন। অন্যদিকে ২২.৩ শতাংশ মনে করেন তাদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি খণ্ডকালীন হওয়া উচিত, অর্থাৎ সভা পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করবেন।

সারণি ৯: স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালনের সময়সূচি সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	পূর্ণকালীন (নির্বাহী দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব)	খণ্ডকালীন (নির্বাহী দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব)	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৭০.৯	২২.৯	৫.৭	০.৫	১০০.০
শহর	৭৪.৪	২০.৯	৩.৯	০.৭	১০০.০
মোট	৭২.১	২২.৩	৫.১	০.৬	১০০.০

গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা: গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তিতে বর্তমান 'গ্রাম আদালত' ব্যবস্থা কার্যকর মনে করেন মাত্র ২৪.৩ শতাংশ উত্তরদাতা। ৩৪.৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এ আদালত আংশিকভাবে কার্যকর। অন্যদিকে ২১.৬ শতাংশ উত্তরদাতার মতে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা কার্যকর নয়।

সারণি ১০: গ্রাম আদালত ব্যবস্থার কার্যকারিতা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	কার্যকর	আংশিকভাবে কার্যকর	কার্যকর নয়
পল্লী	২৪.৭	৩৫.৮	২০.৭
শহর	২৩.৩	৩২.০	২৩.৩
মোট	২৪.৩	৩৪.৬	২১.৬

উপজেলা পর্যায়ে আদালত পুনঃপ্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা-ভাবনা চলমান। একসময় উপজেলা পর্যায়ে আদালতের কার্যক্রম চলমান ছিল। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠার বিষয় সমর্থন করেন ৮০.৪ শতাংশ উত্তরদাতা। অন্যদিকে ১২.৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন উপজেলা পর্যায়ে আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই।

সারণি ১১: উপজেলা পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালত পুনরায় প্রতিষ্ঠা সমর্থন সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	মোট
পল্লী	৭৯.৮	১৩.০	৭.১	১০০.০
শহর	৮১.৭	১১.৯	৬.৩	১০০.০
মোট	৮০.৪	১২.৬	৬.৯	১০০.০

দুর্বল পৌরসভাগুলো বাতিলকরণ: বিগত সময়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় বেশকিছু ইউনিয়ন পরিষদকে পৌরসভা ঘোষণা করা হয়েছে। গঠনকালীন সময়ে সেগুলো আইনানুগভাবে গঠিত হয়নি। এসব পৌরসভাগুলোর আর্থিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল রয়ে গেছে। তারা নিরাপদ পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনাসহ জরুরি পৌর সেবাগুলো সঠিকভাবে প্রদান করতে পারে না। তাদের কর্মীদের বেতন-ভাতাও নিয়মিত পরিশোধ করতে পারে না। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঘোষিত এসব দুর্বল পৌরসভাগুলোকে যাচাই-বাছাই করে বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন ৭২.৬ শতাংশ উত্তরদাতা। অন্যদিকে ১৬.৪ শতাংশ উত্তরদাতা এ উদ্যোগ নেওয়া উচিত নয় বলে মত দিয়েছেন।

সারণি ১২: দুর্বল পৌরসভাগুলোকে যাচাই-বাছাই করে বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	জানি না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৭১.৭	১৬.১	১১.২	১.১	১০০.০
শহর	৭৪.৬	১৭.০	৭.৪	১.০	১০০.০
মোট	৭২.৬	১৬.৪	৯.৯	১.১	১০০.০

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ নির্বাচন: আইন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদসমূহে প্রতি পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে প্রথম ও শেষবারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকার মনোনীত সদস্যদের দ্বারাই অগণতান্ত্রিক উপায়ে এই পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৮৫.৬ শতাংশ উত্তরদাতা অবিলম্বে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন চান। অন্যদিকে ১১.৬ শতাংশ উত্তরদাতা এ নির্বাচন চান না।

সারণি ১৩: পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা পরিষদে নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	মোট
পল্লী	৮৪.১	১৪.১	১.৭	১০০.০
শহর	৮৭.৩	৮.৫	৪.২	১০০.০
মোট	৮৫.৬	১১.৬	২.৮	১০০.০

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদে নির্বাচনের ইতিবাচক প্রভাব: জরিপের অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদসমূহে নির্বাচন হলে তা গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে (৮৩.৮ শতাংশ), দুর্নীতি হ্রাস করতে (৬৭.৭ শতাংশ) এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ গঠনে (৬৫.৫ শতাংশ) সহায়তা করবে।

সারণি ১৪: পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদে নির্বাচনের সম্ভাব্য ইতিবাচক প্রভাব সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

	পল্লী	শহর	মোট
গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা	৮০.৩	৮৮.০	৮৩.৮
দুর্নীতি হ্রাস করা	৬৫.৯	৬৯.৯	৬৭.৭
জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ গঠন	৬১.৪	৭২.৭	৬৬.৫

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ: জরিপের অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে, তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হল ইউনিয়ন পরিষদ (৯২.৮ শতাংশ)। পরবর্তী প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ হল উপজেলা পরিষদ (৮৩.১ শতাংশ), প্রথাগত ব্যবস্থা (রাজা-হেডম্যান-কারবারী ব্যবস্থা) (৭৪.৫ শতাংশ) এবং জেলা পরিষদ (৬৫.৩ শতাংশ)। আর আনুপাতিকভাবে কম উত্তরদাতা মনে করেন যে পৌরসভা (৪২ শতাংশ) ও বাজার ফান্ড (২৯.৯ শতাংশ) এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সারণি ১৫: পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

	পল্লী	শহর	মোট
ইউনিয়ন পরিষদ	৯৬.০	৮৮.৯	৯২.৮
উপজেলা পরিষদ	৮২.০	৮৪.৫	৮৩.১
প্রথাগত ব্যবস্থা (রাজা-হেডম্যান-কারবারী ব্যবস্থা)	৮২.১	৬৫.১	৭৪.৫
জেলা পরিষদ	৬৭.৩	৬২.৯	৬৫.৩
পৌরসভা	৩৫.৯	৪৯.৫	৪২.০
বাজার ফান্ড	২৬.৩	৩৪.৪	২৯.৯

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর: প্রায় সকল উত্তরদাতা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো যথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হোক এটি চান (৯০.৯ শতাংশ)। মাত্র ৯.১ শতাংশ উত্তরদাতা এটি চান না।

সারণি ১৬: পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর সংক্রান্ত মতামত (উত্তরদাতাদের শতাংশ)

এলাকা	হ্যাঁ	না	মোট
পল্লী	৯৪.৭	৫.৩	১০০.০
শহর	৮৬.২	১৩.৮	১০০.০
মোট	৯০.৯	৯.১	১০০.০

এছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পদ্ধতি ও পরিষদের গঠন নিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা , ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠন, সিএসও, এনজিও, স্থানীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রায় ৩০টি সরাসরি আলোচনা এবং ই-মেইল, বর্তমানে স্থানীয় সরকারে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে নির্বাচন সম্পন্ন হচ্ছে, যেখানে চেয়ারম্যান ও মেয়র সরাসরি এলাকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতিতে। সুতরাং স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যাচ্ছে। এ বিষয়ে মতবিনিময় সভার অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে স্থানীয় নির্বাচন ও পরিষদ পরিচালনার পরিষদের গঠনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক মতামত এসেছে। কিন্তু জরিপ পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটি নিয়ে বিভ্রান্তি ও জটিলতা তৈরি হওয়ার কারণে জরিপের ফলাফলে এ বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে নাকি পরে হবে সে বিষয়ে নির্বাচন সংস্কার কমিশনের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী পরিচালিত জরিপে জনগণের পরিষ্কার মতামত এসেছে। তাই এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে তথ্য পুনরায় তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজনীয় মনে করেনি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি এ তিন জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রায় ৮৬ শতাংশ উত্তরদাতা জেলা পরিষদ নির্ববাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দান করেন।

.....x.....